# ইসলাম ও জীবন

মুহম্মদ নূরুল করিম
এম. এ. বি. টি

বাংলা একাডেমী : ঢাকা

প্রথম প্রকাশ : মে, ১৯৫৮

প্রকাশক : ফজলে রাব্বী
পরিচালক
প্রকাশন-মুদ্রণ-বিক্রয় বিভাগ
বাংলা একাডেমী
ঢাকা

প্রচ্ছদ : গোপেশ মালাকার

মুদ্রণ : নাহার আর্ট প্রেস
৫/১, নবেন্দ্রনাথ বসাক লেন
ঢাকা—১

# ভূমিকা

বাংলাদেশ একটি মুসলিম প্রধান এলাকা। সংখ্যানুপাতে বাংলাদেশ পৃথিবীর মধ্যে অষ্টম স্থান অধিকার করেছে এবং মুসলিম অধিবাসীর সংখ্যানুপাতে মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে ইহার স্থান হলো দ্বিতীয়। অর্থাৎ ইন্দোনেশিয়ার পরেই হলো বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ একটি আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র। ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র এবং জাতীয়তাবাদ হলো বাংলাদেশ সরকারের মূল লক্ষ্য। ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে এখানে ধর্মহীনতা বুঝায় না এবং সেজন্যই ধর্মীয় কার্যাদি এবং অনুষ্ঠানাদিতে সরকারী প্রত্যক্ষ সাহায্যেরও ব্যবস্থা রয়েছে। এ উদার নীতির পরিপ্রেক্ষিতে এবং মুসলমানদের ধর্মীয় কর্তব্যবোধের তাগিদেই তাদের সবাইকে ইসলামী মূল নীতিগুলি জানতে হবে এবং অনুধাবন করতে হবে। এ নীতিগুলি বিশ্লেষণ করে এবং মহানবী ও সাহাবা কেরামদের আদর্শ অনুকরণ করে ইসলামের মহান শিক্ষার দ্বার উন্মোচন করতে হবে। তাহলেই সমাজে স্বার্থ দ্বন্দ্বের অবসান সম্ভব হতে পারে। হিংসা, দ্বেষ, কলহ এবং সমাজ-বিরোধী কার্যাদির বিলোপ সাধিত হয়ে এক নব যুগের সূচনা হতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ ইসলাম শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এ দিক দিয়ে সমাজতন্ত্রের সাথে এর নীতিগত মিল রয়েছে—যা গণতন্ত্রেও বিশ্বাসী। সামাজিক উদারনৈতিকতাও এর একটি মূলনীতি, যার সামাজিক চরিত্র ধর্মনিরপেক্ষতা থেকে অভিন্ন। আবার তা জাতীয়তাবাদেও বিশ্বাসী। "দেশের জন্য ভালবাসা ঈমানেরই অংশ বিশেষ" বলে মুসলমানগণ বিশ্বাস করেন। আপন দেশকে ভালবাসা এবং এর সর্ববিধ উন্নতি সুসংহত করার নামই জাতীয়তাবাদ। তাই ইসলাম সর্বপ্রথমে মূল আরব ভূমিতেই জাতীয়তার ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। নিজের পরিবার-পরিজনকে ভালবাসো, ভাইবোনকে ভালবাসো, নিকটতম আত্মীয়স্বজনদেরকে ভালবাসো, পাড়াপড়শীকে ভালবাসো,

জন্মভূমি বা আপন দেশকে ভালবাসো, দেশের মানুষকে ভালবাসো এবং এরপর ভালবাসো বিশ্ববাসীকে—এ হলো ইসলামের শিক্ষা। আমি আমার লিখিত ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানিতে ইসলামের এবম্বিধ আদর্শ-ভিত্তিক মূলনীতিগুলি আনুষ্ঠানিক কার্যবিবরণের মধ্যে সহজ-সরলভাবে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছি। আশাকরি, এর ফলে পাঠক-পাঠিকার মনে ইসলামের উদার নীতির প্রতিফলন দেখা দেবে, সমাজ উপকৃত হবে এবং আমার শ্রম সার্থক হবে।

বিনীত
—গ্রন্থকার

# সূচীপত্র

## প্রথম অধ্যায়



## দ্বিতীয় অধ্যায়



## তৃতীয় অধ্যায়



## চতুর্থ অধ্যায়

দশম অধ্যায়



একাদশ অধ্যায়



দ্বাদশ অধ্যায়



ত্রয়োদশ অধ্যায়



চতুর্দশ অধ্যায়

## বিংশ অধ্যায়



## একবিংশ অধ্যায়

## প্রথম অধ্যায়

# ধর্মের প্রয়োজনীয়তা

### ধর্ম মানুষের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু

"ধর্ম বলতে বাইরের এমন এক শক্তিতে মানুষের বিশ্বাসকে বুঝায় যা দিয়ে সে তার ভাবপ্রসূত চাহিদা মেটাতে চেষ্টা করে, জীবনে স্থিতিশীলতা অর্জন করতে সক্ষম হয় এবং যা উপাসনা এবং জনকল্যাণ সাধনের মাধ্যমে সে প্রকাশ করে থাকে।"[১]

মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব, সে তার বুদ্ধি-বিবেচনা এবং কল্পনাশক্তি দ্বারা পশু-জগৎ এবং প্রাকৃতিক জগতের উপর কর্তৃত্ব লাভ করতে সক্ষম হয়েছে; আধুনিক যুগে সে জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে স্বাধীনভাবে বিচরণ করার ক্ষমতাও অর্জন করেছে, তার আপন সাধনা ও অধ্যবসায় দ্বারা তার অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ সাধন করে সে যুগে যুগে বিশ্ব-সভ্যতায় তার অবদান রেখে যেতেও সক্ষম হয়েছে। কিন্তু সে তার উন্নতি এবং আত্মবিকাশের সাথে সাথে তার সীমিত জ্ঞান ও ক্ষমতার কথাও বুঝতে পেরেছে। মানুষ কোথা হতে আসে এবং কোথায় চলে যায় এবং কেনই বা সে এত অল্প সময়ের জন্য এই অনিশ্চিত জীবন-প্রদীপ নিয়ে এই ধরাধামে এসে থাকে, কোন্ শক্তির দ্বারা তার এই আসা যাওয়া এবং সুখ-দুঃখ নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে ইত্যাদি বিষয় নিয়ে সে গভীরভাবে চিন্তা করে আসছে। শুধু তাই নয়, প্রাকৃতিক বিবর্তন, দিন-রাত এবং চন্দ্র-সূর্যের আবর্তন, ঝড়-ঝঞ্ঝা, বিদ্যুৎ-প্রবাহ, বজ্র ইত্যাদির মূলে কোন্ শক্তিই বা নিহিত রয়েছে তাও সে ভেবে দেখছে। মানুষ তার সীমিত জ্ঞান দ্বারা যুগে যুগে নানাভাবে এই শক্তির সন্ধান লাভের সাধনা করে এসেছে। প্রাচীনকালে সে বহু দেব-দেবীর উপাসনা করেছে, বৈচিত্র্যময় প্রকৃতির নানা

চমকপ্রদ বস্তুকে সে দেব-দেবী জ্ঞানে আরাধনা করেছে। চন্দ্র, সূর্য, বজ্র প্রভৃতিকে সে ক্ষমতার আধার মনে করে উপাসনা করেছে। অবশেষে মানুষ সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার প্রত্যক্ষ অনুগ্রহ লাভ করেই তাঁর প্রকৃত সন্ধান লাভে সমর্থ হয়েছে। যে সব মানুষ খোদার প্রত্যক্ষ অনুগ্রহপ্রাপ্ত হয়ে তাঁর স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধান করে গিয়েছিলেন তাঁদেরকে নবী বা রসুল বলা হয়ে থাকে। তাঁরা মহাপুরুষ নামেও বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে খ্যাত।

## মহাপুরুষদের আদর্শবাদের মর্মকথা

খোদার করুণাসিক্ত মহাপুরুষগণ মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উন্নতির পথ দেখিয়ে দিয়ে সমাজে যুগান্তর সৃষ্টি করে গিয়েছিলেন। তাঁরা খোদার সুমহান অস্তিত্বের সন্ধান দিয়ে মানুষকে কাল্পনিক শক্তির উপাসনা থেকে বিরত রেখেছিলেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ), হযরত মূসা (আঃ), হযরত ঈসা (আঃ) এবং হযরত মুহম্মদ (সঃ) প্রমুখ নবী খোদাপ্রদত্ত ওহী বা জ্ঞানের অধিকারী হয়ে সমাজ সংস্কারে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) প্রথমে আকাশে প্রাচীনকালের মানুষদের মতই এক জ্যোতির্ময় তারকা দেখে তাকে তাঁর সৃষ্টিকর্তা বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু তারকাটি যখন অস্তমিত হয়ে গেল তখন তিনি হতাশ হয়ে পড়লেন। তিনি তাকে খোদা বলে মেনে নিতে পারলেন না। আবার যখন আকাশে চন্দ্র উদিত হলো, তাকেই তাঁর খোদা বলে তিনি মনে ভাবলেন। কিন্তু তারকাটির ন্যায় চন্দ্রও যখন অস্তমিত হয়ে গেল তখন তিনি আরও হতাশ হয়ে পড়লেন। আবার যখন সূর্য উদিত হলো, তা অধিক ক্ষমতার অধিকারী ভেবে তিনি তাকেই খোদা বলে বিবেচনা করলেন। কিন্তু সূর্য যখন তারকা এবং চন্দ্রের ন্যায় অন্তর্হিত হয়ে গেল তখন তিনি পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারলেন যে, এসব উদিত ও অস্তমিত হওয়া কোনটিই তাঁর সৃষ্টিকর্তা হতে পারে না। তিনি তখন আকুল কণ্ঠে বলতে লাগলেন, "আমি এখন আসমান-জমিনের সৃষ্টিকর্তা সেই নিরাকার খোদার দিকেই স্বীয়

মুখ ফিরাইলাম এবং তিনি অতি পবিত্র, তাঁর সাথে আমি অন্য কাউকে অংশীদার করছি না।"[২]

খোদাপ্রদত্ত দিব্যজ্ঞান লাভে সমর্থ হয়ে অবশেষে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর সমকালীন পৌত্তলিক সমাজের সংস্কারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এভাবে অন্য নবীগণও তাঁদের সাধনা-বলে খোদা-প্রদত্ত জ্ঞানলাভ করে মানুষকে আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে পরিচালিত করেছিলেন।

মহাপুরুষদের প্রবর্তিত ধর্ম কেবল সর্বশক্তিমানের একত্ববাদের মহিমা প্রচারে সীমিত ছিল না, তা মানুষের জন্য এক অতি উন্নতমানের জীবন-দর্শন এবং সমাজ বিধান রচনা করতেও সক্ষম হয়েছিল। তাঁদের প্রবর্তিত সমাজ-ব্যবস্থা ছিল জনকল্যাণমূলক, কেননা তাঁদের চিন্তাধারা ও কার্য-বিধি ছিল খোদাকেন্দ্রিক, আত্মকেন্দ্রিক নয়, তাই তাঁদের ধর্ম যুগে যুগে মানুষকে উন্নতির পথে এগিয়ে দিয়েছে। মানুষের মধ্যে যা কিছু উত্তম এবং মহান তা ধর্মেরই অবদান। হযরত ইব্রাহীম (আঃ), হযরত মূসা (আঃ), হযরত ঈসা (আঃ) এবং হযরত মুহম্মদ (সঃ) প্রমুখ মহাপুরুষ মানুষকে নৈতিক অধঃপতনের নিম্নস্তর হতে উদ্ধার করে মানব-সভ্যতার ইতিহাসে নবযুগের সূচনা করেছিলেন।

## ইসলাম ধর্ম

ইসলাম ধর্ম বিশ্ব-সভ্যতার এক প্রদীপ্ত নক্ষত্র বিশেষ। ইসলাম সর্ব-শেষ ধর্মীয় বিধান। পূর্ববর্তী নবীদের ধর্মীয় বিধানকে ইসলাম অনুমোদন করে। অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি এর বিরূপ ভাব নেই। ইসলাম নিজেকে মানুষের পার্থিব এবং পারলৌকিক উন্নতির চাবিকাঠি বলে দাবি করে। বিশ্বাসীদের সর্বাধিক কল্যাণ সাধন করাই এর প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য। বিশ্ব-নবী বলেছেন, "সৃষ্টজগৎ খোদার পরিবারেরই অন্তর্ভুক্ত; তিনি তাকেই সবচেয়ে বেশী ভালবাসেন যে তাঁর পরিবারের অধিক উপকার সাধন করে।" স্রষ্টাকর্তার একত্ববাদকে কেন্দ্র করে জাগতিক উন্নতি বিধান করে যাওয়াই এর কাম্য। এর প্রবর্তক হযরত মুহম্মদ (সঃ) মানব-সভ্যতার গতি পরিবর্তন করে দিয়েছেন। তিনি একটি দাস সম্প্রদায়কে

মানুষের নেতৃত্বে সমাসীন করে দিয়েছেন; এমন কি মানব জাতির জীবনধারা ও সমাজ-পদ্ধতিতে তিনি আমূল পরিবর্তনের অনুপ্রেরণা দিয়ে গেছেন।'[৩]

## সাংস্কৃতিক বিকাশে ধর্মীয় চেতনা

ডঃ ইকবাল যথার্থই বলেছেন যে, পারস্পরিক আকর্ষণী শক্তি ব্যতীত যেমন সৌরজগৎ টিকে থাকতে পারে না তেমনি ধর্মীয় চেতনা ব্যতীত কোন জাতির অস্তিত্ব টিকে থাকতে পারে না। ধর্মীয় চেতনা জাতিকে তার সাংস্কৃতিক বিকাশ সাধনেও উদ্বুদ্ধ করে তোলে। যুগে যুগে ইতিহাস এর সাক্ষ্য বহন করে আসছে। উদাহরণস্বরূপ প্রাচীন ভারতের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ গুপ্তযুগের সাহিত্য, শিল্পকলা ও ভাস্কর্যের ওপর গুপ্ত সম্রাটদের ধর্মীয় চাপ দেখতে পাওয়া যায়। এ যুগের হিন্দু সাহিত্যিক কালিদাস, হরিসেন প্রমুখ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রেরণা লাভ করে গুপ্তযুগের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেছিলেন। ধর্মীয় ঘটনাকে কেন্দ্র করে আবার এ যুগের শিল্পীরা প্রস্তরেও প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ইসলামের আবির্ভাবের সাথে সাথে মুসলমানদেরও যে ধর্মীয় চেতনার উন্মেষ হয়েছিল তারই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের সাহিত্য, দর্শনশাস্ত্র, স্থাপত্যশিল্প ইত্যাদির প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল। ইসলামের অনুসারিগণ ধর্মীয় প্রেরণা লাভ করে কেবল স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শনস্বরূপ জগদ্বিখ্যাত কর্ডোভা বা দামেস্কের বড় মসজিদের মতো ইবাদতগাহ নির্মাণ করে ক্ষান্ত হন নি, তাঁরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখা-প্রশাখাতেও ব্যুৎপত্তি লাভ করে বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে তাঁদের অমূল্য অবদান রেখে গেছেন। তাঁদের দ্বারা অনুপ্রাণিত ও পরিচালিত দর্শন এবং শিক্ষার ঝঙ্কার এককালে আতলান্তিক মহাসাগরের উপকূল হতে পূর্বদিকে ভারত মহাসাগর এবং এমন কি সুদূর প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় মুসলিম শাসিত আফ্রিকার সিউটা, তাঞ্জির, ফেজ ও মরক্কো, মুসলিম স্পেনের কর্ডোভা ও গ্রানাডার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছিল।

**ধর্মের সার্থকতা**

ধর্মের প্রাণকেন্দ্র হলো বিশ্বাস বা ঈমান। ঈমান নিছক অনুভূতির চেয়ে বড়। তা অকপটভাবে পালন করলে চরিত্রকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। ধর্মের বাঁধন না থাকলে মানুষ পশু স্তরে এসে পড়তো। মানুষের বাহির এবং ভেতরের জীবনস্রোতের নিয়ন্ত্রণ এবং রূপায়ণ এর উদ্দেশ্য। ধর্মে গোঁড়ামির কোন স্থান নেই। প্রেম, ভালবাসা, ভ্রাতৃত্ব, সহানুভূতি, সমাজসেবা ইত্যাদি ধর্মের মূল কথা। মানুষ স্বভাবতই স্বার্থপর এবং আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়তে চায়। কেবল ধর্মের আশ্রয় নিলেই সে স্বার্থপরতার ঊর্ধ্বে উঠতে সক্ষম হতে পারে, সে বিশ্বপালকের ইহকাল এবং পরকালের করুণা লাভের আশায় বিশ্ববাসীর কল্যাণ সাধনে অগ্রসর হতে পারে। ধর্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হয়ে সে সমাজের জন্য অম্লান বদনে যে ত্যাগ স্বীকার করে, তা স্থায়ীভাবে তার হৃদয়ে এক অবর্ণনীয় আনন্দের অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। স্বার্থপ্রণোদিত সমাজ-সেবা দ্বারা স্থায়ী এবং নিরাময় শান্তি লাভ হয় না। তাই মহাপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে মানুষ যুগে যুগে উন্নতির উচ্চ হতে উচ্চতর সোপানে আরোহণ করতে সমর্থ হয়েছে। আবার তাঁদের অন্তর্ধানের ফলে তাঁদের প্রবর্তিত ধর্মপথে মানুষ বিচ্যুত হয়ে ধর্মের নামে নানা কেলেঙ্কারীর সৃষ্টি করে অবঃপতনের নিম্নস্তরে পড়েছে এবং এরই পরিপ্রেক্ষিতে এবং প্রতিক্রিয়া স্বরূপ আধুনিক যুগে ধর্মের প্রতি সর্বত্র তাচ্ছিল্যের ভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। মুসলমানগণ যতদিন ইসলামের স্বকীয় পবিত্রতা এবং আদর্শ রক্ষা করে চলতে পেরেছিল ততদিন তা গৌরবোজ্জ্বল যুগের সূচনা করেছিল, কেননা তাতে পৌরোহিত্য প্রথার ঠাঁই নেই। তাতে স্বাধীন চিন্তার অবকাশ এবং জ্ঞান-সাধনার অনুপ্রেরণা রয়েছে। যখনই মুসলমানগণ এই মূল বিষয়গুলি বর্জন করে কেবল বাহ্যিক আবরণের আশ্রয় নিয়ে নিষ্ক্রিয়, স্বার্থান্বেষী এবং বিলাসী হয়ে পড়েছে তখনই তাদের পতন হতে শুরু করেছে।[৪]

মানব-প্রেম ধর্ম মাত্রেরই একটি মূলনীতি। ইসলাম, খ্রীস্টান, বৌদ্ধ, হিন্দু প্রভৃতি প্রত্যেক ধর্মেরই একটি মুখ্য উদ্দেশ্য মানব-কল্যাণ সাধন।

ধর্মের এই উদার নীতির দরুনই এককালে ভারতীয় উপমহাদেশে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান সম্প্রীতির সাথে সহ-অবস্থান করেছিল এবং কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন পরিচালনা করেছিল। তাই ধর্মের এ জাতীয় মূলনীতি ও আদর্শের আলোকে একে বিচার করতে হবে। আধুনিক বস্তুবাদ মানুষকে ধর্ম হতে বহু দূরে সরিয়ে রেখেছে। "প্রকট আত্মসর্বস্বতা, অফুরন্ত ঐশ্বর্য-পিপাসা তাকে ক্রীতদাসে পরিণত করেছে; অপরপক্ষে তার লাভ হয়েছে জীবন-ব্যাপী অবসাদ।"[২]

বস্তুবাদ মানুষকে অনিন্দনীয় শান্তির অধিকারী করতে পারে না। মানুষ তার কর্মময় জীবনের স্বার্থদ্বন্দ্বের মধ্যে শান্তি খুঁজতে গিয়ে অবশেষে তা পায় ধর্মের সুশীতল ছায়ায়। মানুষের হৃদয়ের অভাব পরিপূরণ করে ধর্ম। কারণ তা তার হৃদয়ের চির আকাঙ্ক্ষিত বস্তু। তাই ব্যক্তিগত পর্যায়ে চীন ও রাশিয়ার মতো দেশসমূহেও ধর্ম বিলীন হয়ে যায় নি। ইসলাম ধর্মের প্রভাব বোখারা, সমরকন্দ, তাসকন্দ, টোকিও, সাংহাই সর্বত্রই পরিদৃষ্ট হয়ে থাকে।

বিচারবুদ্ধি এবং মনস্তত্ত্বের দিক দিয়েও ধর্মের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। পাশ্চাত্যের অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তিও ধর্মের গুরুত্ব অনুধাবন করেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, জেমস্ জিনস্ (James Jeans) একজন নাস্তিক্যবাদী হয়েও অবশেষে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, খোদাকে বিশ্বাস না করে বিজ্ঞানের কোন জটিল সমস্যার সমাধান করা যায় না। প্রসিদ্ধ সমাজ-বিজ্ঞানী জিনস্ ব্রীজ্ (Jeans Bridge) ধর্মের সার্থকতার ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে ইসলাম ধর্মের কৃতিত্বের প্রশংসা করেছেন। তাঁর মতে ইসলাম পার্থিব এবং আধ্যাত্মিক মতের অতি চমৎকার সমন্বয় সাধন করে এক অভিনব জীবন-পদ্ধতি রচনা করতে সমর্থ হয়েছে। প্রসিদ্ধ ইংরেজ লেখক সমারসেট মম (Sommerset Maugham) আধুনিক যুগে ধর্মের পরিবর্তে বিজ্ঞানের প্রতি সমগ্র ইউ-রোপবাসীর অধিক আসক্তির কথা উল্লেখ করে দুঃখ প্রকাশ করেছেন; কেননা বিজ্ঞান মানুষকে নিরানন্দ শান্তিদান করতে পারে না। বিজ্ঞা-নের চোখে আজ যা সত্য কাল তা অসত্য বলে প্রমাণিত হয়।

আবার কাল যা অসত্য বলে বিবেচিত হয়েছে আজ তা সত্য বলে প্রতিভাত হয়ে থাকে। সৃষ্ট জগতের সৃষ্টির রহস্য উদঘাটন করা আজও বিজ্ঞানের পক্ষে সম্ভবপর হয়ে ওঠে নি। তাই বিজ্ঞান সকল বিষয়েই মানুষের হৃদয়ে অস্থিরতার বীজ উপ্ত করে দেয়। এ বিশ্বজগৎ পরিবর্তনশীল। এ পরিবর্তনের মধ্যে এবং জীবন-সংগ্রামের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে মানুষকে 'সদা চঞ্চল জীব' হিসেবে আমরা দেখতে পাই। একমাত্র সর্বশক্তিমানের ওপর বিশ্বাস রেখে সে তার হৃদয় চাঞ্চল্যের ঊর্ধ্বে উঠতে পারে। প্রসিদ্ধ পারসিক সূফী কবি জালালউদ্দীন রুমী পবিত্র কুরআনের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছেন, "ওহে তুমি যদি হৃদয়ের নিগূঢ় তত্ত্বের অন্বেষণকারী হয়ে থাক তবে পড় এই পবিত্র কুরআন; তুমি যদি হৃদয়ের প্রকৃত শান্তির অধিকারী হতে চাও তবে পড় এই পবিত্র কুরআন; তুমি যদি সৃষ্টির রহস্য উদঘাটন করতে চাও তবে পড় এই পবিত্র কুরআন।"

ধর্ম মানুষের জীবনে শৃংখলা এনে দেয় এবং পরসেবায় আত্মনিয়োগ করতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। ফরাসী বিদ্রোহকালীন সন্ত্রাসবাদী রবেসপায়ার (Robespierre) ধর্মত্যাগী হয়েও অবশেষে খোদার অবতারণা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কারণ, রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতার অধিনায়ক হয়েও জনগণের ধর্মবিশ্বাস বা খোদাকে বিশ্বাস ছাড়া দেশের শৃংখলা বিধান করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় বলে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তাঁকে অবশেষে শৃংখলা রক্ষার জন্য ধর্মের আশ্রয় নিতে হয়েছিল।

ধর্ম ভাল কাজে অনুপ্রেরণা দেয়, বিপদ এবং দুঃখ-দুর্দশা মানুষের হৃদয়ে শক্তি দান করে। মানুষের সুখ-দুঃখ খোদার ইচ্ছায়ই পরিচালিত হয় ভেবে এবং পরকালের অনন্ত শান্তির আশায় সে সংযম ধারণ করে খোদার সাহায্য প্রার্থনা করে থাকে এবং হৃদয়ে শক্তি লাভ করে থাকে। মানুষ শ্রেষ্ঠ উপাদানে সৃষ্ট। কিন্তু ধর্মের প্রতি উদাসীন হয়ে সে ইহলোকের সুখ-সম্পদের মোহে পড়ে আজ আত্মঘাতী কলহে লিপ্ত; তার আত্মবিলাসের জন্য রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক সর্ববিষয়ে আধিপত্য বিস্তারের প্রবণতা তাকে ঘিরে ফেলেছে। ফলে সে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে

মানুষের ধ্বংসের পথে পরিচালিত করতে দ্বিধাবোধ করছে না। মানুষ এবং পশু উভয়কেই সে সমভাবে হত্যাযজ্ঞের সামগ্রী রূপে ব্যবহার করতে প্রয়াস পাচ্ছে; সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হয়েও সে আজ ধর্মীয় দৃষ্টিতে অধঃপতনের অতি নিম্নস্তরে এসে পড়েছে। তাই কুরআনে বলা হয়েছে, বাস্তবিকই আমি মানুষকে শ্রেষ্ঠ উপাদানে সৃষ্টি করেছি; অতঃপর (তার কাজের দরুন) তাকে আমি সর্ব নিম্নস্তরে পতিত করে থাকি; তবে তারা ব্যতীত যারা খোদার ওপর বিশ্বাস রেখে ভাল কাজ করে থাকে, তাদের জন্য উত্তম পুরস্কার অবধারিত করা হয়েছে।[৬]

আজ বিশ্বে শান্তি এবং শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করতে হলে মানুষকে ধর্মীয় ভাবে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। তার মনুষ্যত্বের নিকট তার পশুত্বকে কুরবান করে দিতে হবে, তবেই তার মুক্তিলাভের সম্ভাবনা এবং মহিমান্বিত খোদা-তায়ালার সান্নিধ্য লাভের আশা ফলপ্রসূ হবে।[৭]

ধর্ম মানুষকে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে এবং নিঃস্বার্থভাবে মানব-কল্যাণ সাধনে উৎসাহিত করে। ত্যাগের অনির্বচনীয় আনন্দ বিশ্বাসী মানুষ ব্যতীত কেউ অনুভব করতে পারে না। সে দুনিয়ার ক্ষমতা বা সুনাম অর্জন করার জন্য লালায়িত থাকে না, সে অনন্ত কালের অনন্ত শান্তির আশায় এ আত্মত্যাগের মাধ্যমে খোদার সন্তুষ্টি বিধান করতে চেষ্টা করে। তাই বহু ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি এই মহান উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়ে তাঁদের জীবন উৎসর্গ করে গেছেন।

বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব অগ্রগতি এবং মানুষের অন্তহীন ঐশ্বর্য পিপাসার ফলে ধর্মের আনুষ্ঠানিক ভিত্তি কতকটা ভেঙ্গে পড়েছে এবং তার সাথে সাথে সমাজ-বাঁধনের নৈতিক ভিত্তিও শিথিল হয়ে পড়েছে। তাই বর্তমান যুগের মানুষকে নতুন নৈতিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং তার জন্য বলিষ্ঠ চরিত্রের অধিকারী মানুষ প্রয়োজন, আর এই চরিত্র একমাত্র ধর্মের কাছেই পাওয়া যেতে পারে; কারণ ধর্মের পূর্ণ বিকাশ ঘটলে মানুষ এক উন্নত ও বলিষ্ঠ চরিত্রের অধিকারী হয় এবং তখন সে আর শুধু অন্ধ বিশ্বাসের বন্ধন, পুরোহিতানুগত্য বা গতানু-গতিক ক্রিয়াকলাপে আবদ্ধ থাকে না। মানবচিত্তের এরূপ একটি

বিশ্বাসপুষ্ট প্রকাশই তার ব্যক্তিত্বকে বর্তমান জীবনে অগ্রগতির সহায়ক ও ভবিষ্যৎ জীবনে প্রতিষ্ঠার বাহনরূপে গড়ে তুলতে পারে।[৮]

## টীকা প্রসঙ্গ এবং গ্রন্থালোচনা

১। গেলোয়ে (Galloway)—Philosophy of Religion.

২। আল-কুরআন—সূরা ৬ঃ ৭৯।

৩। ডঃ ইকবাল—Reconstructions of Religious Thoughts in Islam.

৪। এম. পিকথল (Pickthol) - Cultural Side of Islam.

৫। ডঃ ইকবাল—Reconstruction of Religious Thoughts in Islam.

৬। আল-কুরআন—৯৫ঃ৪ ৬।

৭। মওলানা আশরাফ আলী থানবী (রাঃ)—বায়ানুল কুরআন (সূরা হাবু)।

৮। ডঃ ইকবাল—Reconstruction of Religious Thoughts in Islam.

দ্বিতীয় অধ্যায়

# ইসলামী আদর্শবাদের মর্মকথা

## ইসলাম বিশ্বজনীন ধর্ম

ইসলাম কোন বিশেষ মানবগোষ্ঠী বা দেশকেন্দ্রিক ধর্ম নয়। ইসলাম বিশ্ববাসীর জন্য এক উত্তম জীবনদর্শন এবং একটি পূর্ণ জীবন-সংহিতা; জীবন যাপনের এক সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির ওপর এর বুনিয়াদ রচিত। পবিত্র কুরআন ইসলামী আদর্শবাদের এবং ইসলামী সমাজ-ব্যবস্থার মূল আধার বা উৎস। এ উৎসের পরিপোষক মহানবীর অমিয় বাণী ও তাঁর কার্যকলাপ (হাদীস); তাঁরপর তিন যুগের সাহাবী, সাহাবীদের শিষ্য ও প্রশিষ্যদের ধর্মীয় বিষয়ে যে-কোন ঐক্যমত (ইজ্‌মা) এবং কুরআন, হাদীস বা ইজ্‌মার নজির পেশ করে যে-কোন বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত (কেয়াস)। ইসলামী আদর্শবাদের মূল নীতিগুলো মহানবীর জীবদ্দশাতেই রূপায়িত হয়েছিল। তাঁর সমাজ-জীবনের কার্যতৎপরতা মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক যুগান্তকারী অধ্যায় রচনা করেছে। "তাঁর জীবন-সাধনার মূল্যায়ন করতে হলে একথা স্বীকার করতেই হবে যে তাঁর সাধনা কোন আকস্মিক বা বিচ্ছিন্ন ব্যাপার ছিল না। তা ছিল কোন সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতির প্রয়োজনে উদ্ভূত প্রেরণার উৎস, নব সৃষ্টির যাত্রাপথের আরম্ভ।"[১]

মহানবী হযরত মুহম্মদ (সঃ) এর প্রতিষ্ঠিত সমাজ-ব্যবস্থা এবং তাঁর প্রচারিত সহজ-সরল ধর্ম বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং এককালে সভ্য জগতের চিত্তাকর্ষক বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দৈনন্দিন সামাজিক জীবনে ইসলামের অনুসারীদের পালনীয় খুঁটিনাটি বিধিনিষেধ বাদ দিয়ে এর মৌলিক নীতিগুলির প্রতি লক্ষ্য করলে আমরা ইসলামী আদর্শবাদের মর্ম অনুধাবন করতে সক্ষম হবো। এ আদর্শবাদ বিশ্ববাসীকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল। এ শুধু ইহার নীতিমালাতেই

সীমিত ছিল না, মুসলমানদের প্রকৃত ধ্যান-ধারণায়, সমাজ-ব্যবস্থায় এবং বাস্তব কার্যক্ষেত্রে রূপায়িত হয়েছিল। বিশ্বভ্রাতৃত্ব, সাম্য, জনকল্যাণ, সেবা, উদারতা, সহনশীলতা, সামাজিক ন্যায়নীতি, প্রেম, ভালবাসা, মহানুভবতা, গণতান্ত্রিকতা, আত্মবিশ্বাস, আত্মমর্যাদাবোধ ও শোষণহীন সমাজ প্রভৃতি ইসলামী আদর্শবাদের মূল কথা।

ইসলাম পূর্ববর্তী নবীদের নবুয়তে বিশ্বাসী। হযরত মুহম্মদের (সঃ) পূর্বে যে সব নবী ঐশীবাণী লাভ করে পৃথিবীতে খোদার একত্বের মহিমা প্রচার করেছিলেন ইসলাম তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করে। এমন কি তাঁদের প্রচলিত ধর্মকেও মহানবী ইসলাম বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর পূর্বে বহু নবী এসেছিলেন। পবিত্র কুরআনে তাঁদের কয়েকজনের নামের উল্লেখ রয়েছে। এতে অনুল্লিখিত আরও বহু নবী ছিলেন, তাঁরাও ইসলাম প্রচার করেছিলেন এবং খোদার একত্ববাদের মহিমা প্রচার করেছিলেন; তাঁরাও মুসলমানদের শ্রদ্ধার পাত্র। ইসলাম তাই ধর্মের ঐক্যও ঘোষণা করেছে। ইহুদী এবং খ্রীস্টান সম্প্রদায় ধর্মের দিক দিয়ে পরস্পরকে দোষারোপ করে। উভয় সম্প্রদায়ই তাদের ধর্মীয় নিয়মানুসারেই পরিত্রাণের কথা বলে। ইহুদীরা বলে, খ্রীস্টানরা কোনও ভাল কিছুর অনুসরণ করে না; (২ঃ ১১৩)। কিন্তু ইসলাম এমন কোনও সংকীর্ণ মতবাদে বিশ্বাসী নয়। ইসলামের বা কুরআনের মতে, পরিত্রাণ এবং পুরস্কার লাভের অধিকারী সে-ই হবে যে খোদার নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং ভাল কাজ করে (২ঃ ১১২)।

## বিশ্বভ্রাতৃত্ব, সাম্য এবং উদারতা

ইসলাম মানব জাতির প্রতি উদারভাব পোষণ করে এবং বিশ্ববাসীদের জন্য সাম্যের ও ভ্রাতৃত্বের বাণী বহন করে। ইসলামের দৃষ্টিতে দুনিয়ার সকল মানুষ একই আদমের সন্তান, একই খোদার সৃষ্ট; কাজেই এ দিক দিয়ে বিবেচনা করলে মানবজাতি পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। মহানবী আরও বলেছেন, "সব মানুষই একই উপাদান হতে সৃষ্ট। সুতরাং, কালোর ওপর সাদার এবং সাদার ওপর কালোর, আরবের ওপর অনারবের এবং অনারবের ওপর আরবের কোনও প্রাধান্য

নেই।"[২] রাসুলুল্লার এই অমীয় বাণীতে জগতে কালো-সাদা, আরব-অনারবদের মধ্যে তথা বিশ্বজগদ্বাসীর জন্য এক সাম্যের নীতি বিঘোষিত হচ্ছে। তিনি আরও বলেছেন, "সৃষ্ট জাতি খোদারই পরিবার, সুতরাং খোদার নিকট তারাই সবচেয়ে বেশী প্রিয় যারা তাঁর পরিবারের সর্বাপেক্ষা বেশী উপকার সাধন করে।" এ বাণীতে রাসুলুল্লাহ্ জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে মানব-কল্যাণ সাধন করার নির্দেশ দিয়েছেন। কুরআনের বিঘোষিত বাণী অনুযায়ী মানুষ একই জাতির অন্তর্ভুক্ত। এতে বলা হয়েছে, "ওহে মানবমণ্ডলী, আমি তোমাদের একই নরনারী হতে সৃষ্টি করেছি।" (৪৯ : ১৩)

## উদারনৈতিকতা, সুবিচার, সহনশীলতা ও জনকল্যাণ সাধন

উদারনৈতিকতা, সুবিচার ও সহনশীলতা ইসলামের অমোঘ মূলনীতি। এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে এর জনকল্যাণ সাধনের কথা। খোদার সৃষ্ট-জগতের সৃষ্টি সার্থক করে তুলতে হলে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে মানব-কল্যাণ সাধন করা বাঞ্ছনীয় এবং মানব-সমাজের উপকার বিধানের পরিপ্রেক্ষিতেই পরকালে মানুষের কার্যের হিসাব-নিকাশ নেয়া হবে বলে মুসলমানদের বিশ্বাস। পরধর্মের প্রতি ইসলাম বিরূপ ভাব পোষণ করে না। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক লেইনপুল বলেন, ইসলাম পূর্ববর্তী নবীদের ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করে অপরাপর ধর্মের চেয়ে বেশী সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছে।[৩] পরধর্মের নিন্দা বা পরধর্ম প্রবর্তকদের কুৎসা রটনা করা ইসলামে অত্যন্ত গর্হিত কাজ বলে পরিগণিত। পরধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সহনশীলতা প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়ে ইসলাম বিশ্বশান্তির পথ সুগম করে দিয়েছে। এরূপ অন্য কোন দৃষ্টান্ত দুনিয়ার ইতিহাসে পাওয়া যায় না। যারা অন্য ধর্মে বিশ্বাসী তাদের সাথে কোন প্রকার অসদাচরণ না করে যে যার ধর্ম নিয়ে আপনভাবে চলতে থাকার নির্দেশ পবিত্র কুরআনে রয়েছে (৬ :১০৮)। ধর্মীয় ব্যাপারে কোনও প্রকার বলপ্রয়োগ না করার নির্দেশও কুরআনে রয়েছে (২ : ৫৬)।

মহানবী এবং খোলাফায়ে রাশেদীন অমুসলিমদের প্রতি সহনশীলতা এবং নিরপেক্ষতার নীতি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করেছিলেন।

মদীনার সনদে মহানবী মুসলিম ইহুদী নির্বিশেষে সকলকে নাগরিক অধিকার দিয়েছিলেন; ন্যায়নীতি এবং নিরপেক্ষ বিচারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সেন্ট কেথেরিন গির্জার খ্রীস্টানদের যে সনদ দিয়েছিলেন তা সংখ্যালঘুদের প্রতি সহনশীলতা এবং সদয় দৃষ্টির এক মহান আদর্শ স্থাপন করেছিল। এ সনদে রাষ্ট্রের অনুগত খ্রীস্টানদের সব রকম নাগরিক অধিকার এবং নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল। কোনও খ্রীস্টানকে বলপ্রয়োগ করে ধর্মান্তরিত করা বা তাদের ওপর অন্যায়ভাবে কর চাপিয়ে দেয়া ইত্যাদি সর্বপ্রকার অন্যায়-অবিচার হতে তাদের নিরাপদ রাখার সম্পূর্ণ প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল। এমনকি খ্রীস্টানগণ তাদের গির্জা মেরামত বা নির্মাণ বা তাদের ধর্মীয় যে-কোন কাজে সর্বতোভাবে রাষ্ট্রের সাহায্য লাভের প্রতিশ্রুতিও লাভ করেছিল।

মহানবীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে খোলাফায়ে রাশেদীনও সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা বিধান করেছিলেন এবং তাদের সর্বপ্রকার নাগরিক অধিকার উপভোগ করার সুযোগ দিয়েছিলেন। বিশেষ করে হযরত ওমর (রাঃ) তাদের যতটুকু সুযোগ-সুবিধা দিয়েছিলেন তদানীন্তন অন্য কোন সাম্রাজ্যের প্রজাদের ততটুকু অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা ছিল না। উল্লেখযোগ্য যে, রোমান এবং পারসিক সাম্রাজ্যের প্রজাদের অবস্থা ক্রীতদাস অপেক্ষা উন্নত ছিল না। দখলিভূমিতে প্রজারা স্বজাতি হওয়া সত্ত্বেও তাদের কোন প্রকার স্বত্ব ছিল না। তারা ছিল করভারে জর্জরিত, ধর্মীয় নেতাদের উৎপীড়নে অতিষ্ঠ। হযরত ওমর (রাঃ) এই সব দেশ দখল করার পর কুরআন এবং সুন্নার নীতি অনুযায়ী ধর্মীয় অধিকার ও জমিনে স্বত্বাধিকার দিয়েছিলেন এবং তাদের করভার লাঘব করেছিলেন। বায়তুল মোকাদ্দেসের খ্রীস্টানদের যে সনদ দিয়েছিলেন তাতে তিনি তাদের জান, মাল, গির্জা, ক্রস, ধর্মীয় বিষয় সম্পত্তি ইত্যাদির নিরাপত্তায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

শাসন ক্ষেত্রেও হযরত ওমর (রাঃ) সংখ্যালঘুদের ন্যায্য অধিকার দিয়েছিলেন। তিনি তাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোন বিষয়েই তাদের সাথে পরামর্শ না করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন না। ইরাকের ভূমি বন্দোবস্তের সময় তিনি সেখানকার প্রতিনিধি দলকে তলব করে তাদের সাথে বিস্তারিত

আলোচনা করেছিলেন এবং তাদের পরামর্শ অনুসারে সেখানকার ভূমির পত্তন ও রাজস্ব নির্ধারণ করেছিলেন।[৪]

সংখ্যালঘুদের জান-মালের নিরাপত্তা হযরত ওমর (রাঃ) অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। একবার সিরিয়ার কৃষকগণ তাদের শস্যক্ষেত্র সৈন্যগণ নষ্ট করেছে বলে তাঁর নিকট নালিশ করলে তিনি ক্ষতিপূরণস্বরূপ তাদের বায়তুলমাল হতে দশ হাজার দেরহাম দিয়েছিলেন।[৫]

হযরত ওমরের সময় সংখ্যালঘুদের এতটা ধর্মীয় স্বাধীনতা ছিল যে, তারা প্রকাশ্যে শঙ্খধ্বনি করতো, ক্রুশের শোভাযাত্রা করে চলতে পারতো, সর্বপ্রকার ধর্মীয় মেলা, পার্বণ ও উৎসবাদি পালন করতে পারতো। ইসলামের পূর্বে তাদের ধর্মীয় নেতাদের যে সমস্ত অধিকার ছিল তা অবিকল বহাল ছিল।

মুসলিম কর্তৃক কোন অমুসলিম নিহত হলে হযরত ওমর (রাঃ) এর সমুচিত শাস্তি বিধান করতেন। কোন মুসলিম অমুসলিমকে হত্যা করলে তার শাস্তিস্বরূপ তিনি অপরাধী মুসলিমকে প্রাণদণ্ড দিতেন।[৬]

হযরত ওমর (রাঃ) অসহায়, নিরাশ্রয় অমুসলিমদেরও হযরত আবু বকর সিদ্দিকের (রাঃ) ন্যায় বায়তুলমাল হতে সাহায্য করতেন।[৭] হযরত ওসমান (রাঃ) এবং আলীও (রাঃ) অমুসলিমদের একই রকম নিরাপত্তা এবং সুবিধা দিয়েছিলেন।

সুবিচার করা ইসলামের একটি আদর্শ শিক্ষা। কুরআনে নির্দেশ রয়েছে, তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচার করবে তখন ন্যায়ের সহিত তা করবে (৪ : ৫৮)। কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে, "ওহে বিশ্বাসী মানুষগণ, তোমরা ন্যায়নীতি শক্ত করে রক্ষা করবে এবং খোদার সন্তোষ বিধানার্থ সঠিকভাবে সাক্ষ্য দেবে যদিও তা (তোমাদের বিচার এবং সাক্ষ্য) তোমাদের নিজের, তোমাদের পিতামাতার বা নিকটতম আত্মীয়দের পরিপন্থী হয় (৪ : ১৩৫)"। বিচারক্ষেত্রে শত্রুর প্রতিও যেন অবিচার না হয় কুরআনে সে সম্পর্কে নির্দেশ রয়েছে (৫ : ৯)।

কুরআন ইনসাফ বা ন্যায়বিচার করার বেলায় মুসলিম-অমুসলিম পার্থক্য করে না। কুরআন সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করতে আদেশ

করেছে। কথিত আছে যে, মহানবীর কাছে একজন মুসলমান কোনও এক ইহুদীর বিরুদ্ধে নালিশ করেছিল এবং তাঁকে তাঁর গোত্রীয় সকল মুসলমান সাক্ষ্য দিয়ে সাহায্য করেছিল। হযরত (সঃ) নিরপেক্ষ ন্যায়নীতি অনুযায়ী ইহুদীকে বেকসুর খালাস করে দিয়েছিলেন। খোলাফায় রাশেদীনও এ স্যায়নীতির অনুসরণ করেছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) ন্যায়-বিচারকে একটি অবশ্য কর্তব্য বা ফরজ কাজ বলে মনে করতেন। তাঁর চোখে ধনী-নির্ধন, উচ্চ নীচ, মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলে সমান মর্যাদার অধিকারী ছিল। তিনি কাজীদের ন্যায়বিচারের পরীক্ষার জন্য অনেক সময় বাদী বা বিবাদী বেশে বিচারালয়ে হাজির হতেন। তিনি মদীনার কাজী যায়েদ ইবনে-সাবেতকে একবার এ বলে সতর্ক করে দিয়েছিলেন, "যায়েদ, যে পর্যন্ত না তোমার সম্মুখে ওমর এবং একজন সাধারণ মানুষের মর্যাদা সমান হবে সে পর্যন্ত তুমি কাজীর যোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারবে না।"

খলীফাদের নিরপেক্ষ ন্যায়বিচারের কথা ইতিহাসের পাতায় লিখিত রয়েছে। হযরত আলী (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি এক ইহুদীর কাছে তাঁর একটি লৌহবর্ম আমানত রেখেছিলেন। পরে তার নিকট হতে তিনি যখন তা ফেরত চান সে তা দিতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। তখন হযরত আলী (রাঃ) কাজীর কাছে বিচারপ্রার্থী হলেন। কাজী তাঁকে তাঁর স্বপক্ষে সাক্ষী নিয়ে হাজির হতে বললেন। যথাসময়ে হযরত আলী (রাঃ) তাঁর এক পুত্র ও এক চাকরকে নিয়ে কাজীর আদালতে হাজির হলেন। আপন পুত্র এবং চাকরের সাক্ষ্য আইনতঃ গ্রহণযোগ্য নয় বলে কাজী মামলা খারিজ করে দিলেন। হযরত আলী (রাঃ) তখন আমিরুল মুমেনীন ; তা সত্ত্বেও কাজী যে তাঁর পক্ষে রায় না দিয়ে আইনানুযায়ী সঠিক বিচার করেছেন তজ্জন্য তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন।

খলীফা ছাড়া অন্যান্য মুসলিম শাসকদেরও নিরপেক্ষ ন্যায়বিচারের বহু কাহিনী ইসলামের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ রয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, মিসরের গবর্নর আমর ইবনে আসের সময় একজন মুসলিম সেনা একটি যিশুর মূর্তির নাক ভেঙ্গে দিয়েছিল। এজন্য আমরের নিকট নালিশ

করা হলে আমর মূর্তির মালিককে সৈনিকের নাক কেটে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।[৮]

ইসলামী আদর্শবাদে ন্যায়বিচার এবং উদারতা ছিল বলেই এক-কালে সুদূর স্পেন ও ভারতীয় সিন্ধুদেশের অধিবাসীরাও উল্লাসধ্বনি করে মুসলমানদের অভিনন্দন জানিয়েছিল।

## প্রেম, ভালবাসা, মানবতা ও মহানুভবতা

দুনিয়ার ইতিহাসে ইসলাম প্রেম, ভালবাসা, মানবতা ও মহানুভবতার অতুলনীয় নজীর রেখে গেছে। মহানবী খোদায় বিশ্বাসী ছিলেন বলে খোদার সৃষ্ট মনুষ্য জগতের প্রতি তিনি ছিলেন রহমতের মণিস্বরূপ। তাঁর ছিল বিশ্বজনীন প্রেম এবং ভালবাসা। তিনি তাঁর ভালবাসা, প্রেম এবং মহানুভবতার দরুন শত্রুর ওপরও জয়যুক্ত হতে পেরেছিলেন। তিনি শত্রুকেও ক্ষমা করতেন। যে মক্কাবাসীরা তাঁকে নানাভাবে নির্যাতিত করেছিল তিনি মক্কা বিজয়ের পর তাদের ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। এমন দয়া এবং মহানুভবতার নজীর দুনিয়ার ইতিহাসে বিরল। তিনি বলেছেন, "যে মানুষের প্রতি দয়া করে, খোদা তার প্রতি দয়া করে।"

আর একটি ঘটনা। বদরের যুদ্ধে পরাজিত মক্কাবাসীরা তাদের মৃত সৈনিকদের লাশ কবরস্থ না করেই চলে গিয়েছিল; মহানবী নিজেই ঐ সমস্ত লাশ কবরস্থ করেছিলেন। এমন কি, মক্কাবাসীদের এক অসহায় বৃদ্ধা রমণী কোনও এক যুদ্ধক্ষেত্রে পেছনে পড়ে থাকলে তিনি নিজেই তাকে শত্রুসীমান্তে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসেন।

মানবতার ইতিহাসেও ইসলামের অবদান রয়েছে। যখন পৃথিবীতে ঘৃণিত দাসত্বপ্রথা চালু ছিল, মানুষ মানুষকে পশুর ন্যায় ক্রয় বিক্রয় করতো এবং খাটাতো, মহানবী তখন আরবের সেই ঘৃণিত প্রথার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ আল্লাহর সৃষ্টজীব, সে ভালবাসা এবং স্বাধীনতা লাভের অধিকারী, তাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখার অধিকার কারও নেই। মহানবী তাই বহু দাসদাসীকে দাসত্ব বন্ধন হতে মুক্ত করে দিয়েছিলেন এবং দাসত্ব থেকে মুক্তিকে ধর্মের এক

প্রধান কাজ বলে ঘোষণা করেছিলেন। মহানবীর উপদেশ এবং আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বহু সাহাবী, বিশেষ করে হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ্ (রাঃ) প্রমুখ বহু দাস-দাসীকে নিজ অর্থে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি বলেছিলেন, "তোমরা যা খাবে তা তোমাদের গোলাম (চাকর) কেও খাওয়াবে, যা পরবে তা তাদেরকেও পরাবে, জেনে রেখো, তারা তোমাদেরই ভাই।"[১]

হযরতের খাদেম আনাস্‌কে তিনি বিশিষ্ট সাহাবীর শ্রেণীভুক্ত করেছিলেন। হযরত আনাস্ বলেছেন, "আমি বহু বছর ধরে হযরতের খেদমতে ছিলাম; তিনি কোনদিন এমন একটি কটু কথাও বলেন নি যা দ্বারা আমার মনে কষ্টের উদ্রেক হয়।"

## অর্থনৈতিক মূলনীতি

ইসলাম অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এবং সামাজিক ক্ষেত্রে সুবিচার প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী এবং যে-কোন অর্থনৈতিক শোষণের বিরোধী। সমাজে কেউ প্রাচুর্যের মধ্যে থাকবে এবং কেউ দরিদ্র অবস্থায় অনাহারে অর্ধাহারে থাকবে—এটা ইসলামের কাম্য নয়। মহানবী হযরত মুহম্মদ (সঃ) গরীবের দরদী বন্ধু ছিলেন। তিনি গরীবদের সঙ্গে উঠা-বসা করতে ভালবাসতেন। তিনি বলতেন, "আমাকে গরীবদের মাঝে সন্ধান করবে।" তিনি আরও বলেছেন, "শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকিয়ে যাওয়ার আগেই তার পারিশ্রমিক আদায় করে দেবে।" ইসলাম গরীবকে যাকাত, ফেত্‌রা ইত্যাদির মাধ্যমে মালদারদের মালেরও অংশীদার করেছে। নিজের যথাসর্বস্ব পরের জন্য বিলিয়ে দেওয়ার প্রেরণা মহানবী এবং তাঁর অনুসারী খলীফাগণ দিয়ে গেছেন। হযরত তিন দিন পর্যন্ত না খেয়ে অপরকে খেতে দিয়েছেন। তাঁর অনুসারী খলীফাগণও অন্যের জন্যে অতি দীন ভাবে জীবন যাপন করেছিলেন; নিজের অন্ন অপরের মুখে তুলে দিয়েছিলেন। হযরত জাতিধর্ম নির্বিশেষে জনসেবা করতেন, করতে নির্দেশ দিয়েছেন; অনাথ, এতিম, বিপন্ন, অক্ষমদের প্রত্যক্ষভাবে বায়তুল মাল হতে সাহায্য করতেন। ইসলামের সম্প্রসারণ এবং রাজ্য বিস্তৃতির

ফলে হযরত ওমর (রাঃ)-এর সময় কুরআন এবং সুন্নার নীতি অনুযায়ী একটি শোষণহীন, জনকল্যাণমূলক ও উদারনৈতিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছিল। হযরত ওমর (রাঃ) জাতিধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেকটি অক্ষম ও বিপন্ন লোককে বায়তুল মাল হতে অর্থ দিয়ে পূর্ণ ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর ফরমানে কুরআনের এ বাণীটিও লিখে দিতেন, "নিশ্চয়ই সদকা ফকীর, মিসকীন ও মুসাফির বিপন্নদের জন্য" এবং ফকীর বলতে মুসলিম দরিদ্র এবং মিসকিন বলতে অমুসলমান দরিদ্র বলে তিনি ব্যাখ্যা করে দিয়েছিলেন।[১০] পিতামাতা কর্তৃক পরিত্যক্ত বা লা-ওয়ারেশ শিশু সন্তানদের তিনি বায়তুল মালের অর্থ দ্বারা প্রতিপালন করতেন, এতিমের লালন পালন এবং তাদের সম্পত্তির হেফাজতের ব্যবস্থা করতেন।

হযরত ওমর (রাঃ)-ই রাষ্ট্রপ্রধানরূপে সর্বপ্রথম জনগণের খাওয়া পরার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। "গণতন্ত্রের সাথে সমাজতন্ত্রবাদের মিশ্রণ ঘটলে যে সমাজ-ব্যবস্থার সৃষ্টি হয় ইসলামী নীতির স্বাভাবিক লক্ষ্য সেদিকেই।[১১] হযরত ওমর (রাঃ) এ লক্ষ্যে উপনীত হতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন এবং এজন্য প্রত্যক্ষভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। ধনী-দরিদ্র প্রত্যেক ব্যক্তি আল্লাহর দৃষ্টিতে সমান। রাষ্ট্রের রাজস্ব খলীফার ভোগের জন্য নয় বরং জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য—তা ওমর মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন। তাই গরীবদের সাহায্য করতে ধনবান লোক আদিষ্ট হয়েছিল এবং বদান্যতাকে আইনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

হযরত ওমর (রাঃ)-এর সময় জনগণ সাধারণ কোষাগার হতে বৃত্তি লাভ করতো। এ বৃত্তিপ্রথা কেবল মুসলমানদের মধ্যে সীমিত ছিল না। অমুসলমানগণও তাদের আনুগত্য ও বিশ্বস্ত কার্যকলাপের জন্য অনুরূপ বৃত্তি বা সুবিধা লাভে সমর্থ হতো।[১২]

ইসলামী আদর্শবাদে গণতন্ত্রের নীতিও বিদ্যমান রয়েছে। এ সম্পর্কে কুরআন এবং সুন্নার নির্দেশ খোলাফায়ে রাশেদীনের সময় প্রতিপালিত হয়েছিল। তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে কেউ খেলাফতের জন্য প্রার্থী ছিলেন না, জনগণের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ মনোনয়ন দ্বারা তাঁরা ক্ষমতাসীন হয়েছিলেন। মহানবী বলেছেন, "তোমরা নেতৃত্ব বা শাসন-ক্ষমতা

চেয়ো না। তোমরা চেষ্টা এবং অনুরোধক্রমে তা পেলে নিজ দায়িত্বেই তা গ্রহণ করবে; খোদায়ী সাহায্য লাভে বঞ্চিত হবে। অপরপক্ষে তা যদি অযাচিতভাবে লাভ করো তবে খোদার অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হবে।"[৩] খোলাফায়ে রাশেদীন কুরআনের নীতির ভিত্তিতে জনগণের পরামর্শ গ্রহণ করে কার্য পরিচালনা করতেন। কুরআনে বলা হয়েছে, "(গুরুত্বপূর্ণ) কাজে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করবে (৩ঃ১৫৯) এবং তারা (বিশ্বাসিগণ) পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে তাদের কাজ সমাধা করে (৪২ঃ৩৮)"।

হযরত ওমর (রাঃ) বলতেন, জনগণের মতামত ব্যতীত কোন খেলাফতই চলতে পারে না।[৪] খোলাফায়ে রাশেদীন কেবল জনগণের গণতান্ত্রিক মতামত নিয়েই কার্যাদি পরিচালনা করতেন না, তাঁরা গণতন্ত্রের প্রাণস্বরূপ জন-সমালোচনাও বরদাস্ত করতেন এবং তাঁদের কাজের সমালোচনা করতে জনগণকে উৎসাহিত করতেন। তাঁদের সময়কার গণতন্ত্রে সাম্য, ভ্রাতৃত্ব এবং উদারতা পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান ছিল। এ গণতন্ত্র আধুনিক যুগের গণতন্ত্র বা প্রাচীন এথেন্সের গণতন্ত্রের মতো ছিল না, অথচ উভয় গণতন্ত্র হতে তা উত্তম ছিল খলীফাগণ খোদার কাছে নিজ নিজ কাজের জন্য জবাবদিহি করার বিরাট দায়িত্ববোধে তাড়িত হয়ে সকল বিষয়ে জনগণের জন্য আত্মোৎসর্গের নীতি গ্রহণ করেছিলেন। তাই তাদের সময়ে জনগণ একই আদর্শবাদ ও অনুপ্রেরণা লাভ করে সমাজসেবা, ভ্রাতৃত্ববোধ, আত্মোৎসর্গের ইচ্ছা ইত্যাদি নানাবিধ গুণের অধিকারী হতে পেরেছিল। এসব ধর্মভীরু খলীফার শাসনকালের কথা উল্লেখ করে ঐতিহাসিক স্টোডার্ড বলেছেন, "যদি কখনো কোন আদর্শ গণতন্ত্র ছিল বলে বলা যায় তবে ইসলামের প্রথম খলীফাদের সময়কার গণতন্ত্রের বেলায়ই তা প্রযোজ্য।[৫]

খলীফাদের এই গণতান্ত্রিক শাসন অতি উন্নতমানের নৈতিকতার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাই রাষ্ট্রপ্রধানগণ যতদিন কুরআন ও সুন্নার প্রকৃত নীতি অনুসরণ করে চলেছিলেন ততোদিনই তা স্থায়ী ছিল। ব্যক্তিগত এবং বংশগত স্বার্থের দরুন পরবর্তীকালে মহানবী এবং খোলাফায়ে

রাশেদীনের মহান আদর্শ বর্জিত হয়েছিল। ফলে ইসলামী গণতন্ত্রের বুনিয়াদ ভেঙ্গে পড়ে এবং ইসলামের উন্নতির পথও রুদ্ধ হয়ে আসে।

## আত্মবিশ্বাস এবং আত্মমর্যাদাবোধ

ইসলাম একমাত্র আল্লাহরই আনুগত্য স্বীকার করে। এক আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো দাসত্ব ইসলাম বরদাস্ত করে না। তা মানুষকে সর্ব-প্রকার দাসত্বের শৃংখল থেকে মুক্ত ঘোষণা করে তাকে আত্মমর্যাদা জ্ঞানের অধিকারী করে। অধিকন্তু ইসলাম মানুষকে খোদার সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব এবং পৃথিবীতে তাঁরই খলীফা বা প্রতিনিধি বলে ঘোষণা করে। ফলে মানুষ আত্মশক্তি এবং আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে উঠার প্রেরণা লাভ করে। প্রকৃত খোদাভক্ত লোক তাঁর জীবিকা, মান-ইজ্জত, সব কিছুর জন্য এক আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকেন; অন্য কারো নিকট কিছুর জন্য মাথা নত করেন নাঃ খোদার উপর তাঁর ভরসা আছে বলে তিনি আত্মবিশ্বাস এবং আত্মমর্যাদাবোধে সমৃদ্ধ। হযরত মোজাদ্দেদে আল্‌ফেসানী সম্রাট জাহাঙ্গীরকে কুর্ণিশ না করে কারাবরণ করেছিলেন। হযরত আবু হানিফা খলীফার অনুগ্রহকে তুচ্ছ মনে করে তাঁর দরবারে হাজির হওয়াকে আত্মমর্যাদা এবং ঈমানের পরিপন্থী বলে মনে করেছিলেন। ধর্মীয় ইতিহাসে এরূপ বহু উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায়।

## টীকা প্রসঙ্গ ও গ্রন্থ পরিচিতি

১। ডঃ ইকবাল—Reconstruction of Religious Thoughts in Islam.

২। মেশকাত; ইসলামের সাম্যবাদ ও আত্মমর্যাদাবোধের নীতি কিভাবে আফ্রিকার অধিবাসীদের বিংশ শতাব্দীতে উদ্বুদ্ধ করে ইসলাম গ্রহণে অনুপ্রাণিত করেছিল তা প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক Arnold Toynbee তাঁর লিখিত 'The World After the

Peace Conference' নামক প্রবন্ধে (Survey of International Affairs, 192)—23, Introduction) বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন।

৩। লেইনপুল (Lanepoole)—মুহম্মদ (সঃ)।

৪। শিবলী নোমানী—আল-ফারুক।

৫। ঐ

৬। ঐ

৭। ঐ

৮। সাইয়েদ মানাযির আহ্ছান জিলানী—ইমাম আবু হানিফা।

৯। বুখারী।

১০। শিবলী নোমানী—আল্-ফারুক।

১১। সৈয়দ আমীর আলী—History of the Saracens.

১২। ঐ

১৩। মিশকাত।

১৪। কানিযুল উম্মাল।

১৫। স্টোডার্ড (Stoddard)—New World of Islam.

তৃতীয় অধ্যায়

# ওহী ধর্মের মূল ভিত্তি

## মহাপুরুষদের আবির্ভাবের তাৎপর্য

সত্যভ্রষ্ট ও পথভ্রান্ত মানুষকে সুপথে পরিচালিত করার জন্য যুগে যুগে বহু মহাপুরুষ পৃথিবীতে এসেছিলেন। তাঁরা আজীবন সৃষ্টিকর্তার সুমহান অস্তিত্ব, মহত্ত্ব এবং একত্বের বাণী প্রচার করে মানব-সমাজে জাগরণ সৃষ্টি করেছিলেন। সৃষ্টির রহস্য, মানুষের নশ্বর জীবনের কর্তব্য এবং পরকালের অনন্ত সুখের কথা তাঁরা লোক সমাজে প্রচার করেছিলেন। বিশ্বের প্রতিপালক এবং সমগ্র মহাবিশ্বের অধিকারী সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা খোদাতালার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ নির্দেশের মাধ্যমে তাঁরা তাঁদের কথা এবং কাজে প্রেরণা পেয়েছিলেন। তাই এ সকল মহাপুরুষকে প্রেরিতপুরুষ বা নবী বলা হয়ে থাকে। এ সব নবী প্রত্যক্ষভাবে খোদার ফেরেশতা জিব্রাইল (আঃ) কর্তৃক খোদার বাণী পেয়ে লোক-সমাজে তা প্রচার করেছিলেন এবং মানুষের ঐহিক এবং পারলৌকিক উন্নতি বিধানকল্পে জীবন উৎসর্গ করে গিয়েছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে এ সব নবীর মধ্যে কয়েক জনের কথা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ রয়েছে। হযরত আদম (আঃ), হযরত নূহ (আঃ), হযরত দাউদ (আঃ), হযরত সোলায়মান (আঃ), হযরত ইব্রাহীম (আঃ), হযরত ইসমাঈল (আঃ), হযরত ইসহাক (আঃ), হযরত এয়াকুব (আঃ), হযরত মূসা (আঃ), হযরত ঈসা (আঃ) প্রমুখ নবী এবং সর্বশেষ হযরত মুহম্মদ (দঃ)-এর কথা কুরআনে উল্লেখ আছে। তাঁরা ব্যতীত আরও বহু নবী লোকের হিতার্থে খোদার বাণী নিয়ে পৃথিবীতে এসেছিলেন বলে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে; তবে তাঁদের বা তাঁদের সংশ্লিষ্ট ঘটনার কোন উল্লেখ

করা হয় নি। তাই আমাদের সীমিত জ্ঞানে কুরআনে উল্লিখিত এমন নবীদের কথা আমরা বলতে পারি না।

## ওহীর তাৎপর্য

নবীদের ধর্মীয় কাজের প্রেরণা এবং দিশারী ছিল খোদাপ্রদত্ত বাণী বা ওহী। খোদাপ্রদত্ত বলে ওহী মানুষের মঙ্গল বিধানে অতি নির্ভুল, সুস্পষ্ট এবং সর্বোত্তম নীতিমালাই বটে। নবীদের ধ্যান-ধারণা ছিল খোদা-কেন্দ্রিক। তাই তাঁরা খোদার মহান উদ্দেশ্য সাধন ও তাঁর আদেশ প্রতিপালন করার জন্য লোকহিতার্থে তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। নিজেদের জন্য এক মুহূর্তও চিন্তা করার অবকাশ তাঁদের ছিল না। মানুষ স্বভাবতই আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থপর, তার বিবেক বুদ্ধি-বিবেচনা সবই এ স্বার্থপরতার কাছে হার মানে, এমনকি বহু জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিও এর উর্ধ্বে উঠতে পারে না। ইতিহাস এর সাক্ষ্য বহন করছে। যুগে যুগে কত মানুষই তো নিঃস্বার্থভাবে সমাজকে শাসন-শোষণ করার কথা বলে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে আমোদ প্রমোদে গা ঢেলে দিয়েছে; নিজ পরিবার পরিজনের উন্নতি বিধানে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে, অস্থায়ী দুনিয়াকে স্থায়ী মনে করে তারা ধরাকে সরা জ্ঞান করেছে, জনগণের স্বার্থকে বিসর্জন দিয়েছে। নবীগণ এসব স্বার্থান্বেষী মানুষের উর্ধ্বে ছিলেন। স্বার্থান্বেষী মানুষের সামাজিক বিধান নবীদের ধর্মীয় বিধানের ন্যায় নিখুঁত হতে পারে না, তাই নবীদের অবদানের কথা মানুষ যুগে যুগে স্মরণ করে থাকে।

## ইসলামের তাৎপর্য

খোদায়ী বাণী লাভের মাধ্যমে হযরত মুহম্মদ ইসলাম প্রচার করে-ছিলেন। তাই ইসলাম খোদারই মনোনীত ধর্ম। খোদায়ী বাণী বা ওহীর সমষ্টি হলো পবিত্র কুরআন। কুরআন সুদীর্ঘ তেইশ বছর ধরে ধীরে মহানবীর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল।

ইসলাম শ্রেষ্ঠ ধর্মসমূহের অন্যতম এবং সর্বশেষ ধর্ম। তা ভূতপূর্ব নবীদের ওহীপ্রাপ্ত প্রচারিত ধর্মের মর্মকথা বহন করে; কেননা কুরআনে

পবিত্র ধর্মসমূহের সমন্বয় সাধিত হয়েছে এবং সে-সব ধর্মের সংক্ষিপ্ত-সার কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। তাই কুরআনকে ঐশ্বরিক ধর্মসমূহের সমষ্টিও বলা হয়ে থাকে। খোদায়ী বাণীপ্রাপ্ত নবীকে কুরআনে মুসলিম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ যুগে যুগে নবীগণ বিভিন্ন জাতির নিকট যে ধর্ম প্রচার করে গেছেন তা ছিল ইসলাম ধর্ম এবং হযরত মুহম্মদ (সঃ) ছিলেন এ একই ইসলাম ধর্মেরই বাহক। তাঁর হাতে ইসলাম সম্প্রসারিত ও পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। তাই কুরআনকে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলেও আখ্যায়িত করা হয়েছে। এতে ইসলামের বিশ্বজনীন রূপ উদ্ভাসিত হয়েছে। মহানবীর পূর্বে যে সব নবী পৃথিবীতে এসেছিলেন তাঁদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা ইসলামের একটি মৌলিক নীতিও বটে।[১]

ইসলাম শব্দের অর্থ শান্তি এবং খোদার ইচ্ছার কাছে নিজেকে সমর্পণ করা উভয়ই বুঝিয়ে থাকে। সুতরাং মুসলিম বলতে তাকেই বুঝায়, যে মানুষ এবং খোদার সাথে শান্তির সূত্রে আবদ্ধ; অর্থাৎ যে খোদার ইচ্ছার কাছে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করে শান্তি লাভ করেছে এবং মানুষের কল্যাণই জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করে নিয়েছে।

মহিমান্বিত খোদার ইচ্ছাশক্তি সীমাহীন। তাঁর ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করলেই লোকের নিরাপত্তা ও নিরঙ্কুশ শান্তি মেলে। নায়েগ্রার খরস্রোতা জলপ্রপাতের উর্ধ্বগতির বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র পিপীলিকা যদি সাঁতার কাটতে চায় তবে তার মৃত্যু অনিবার্য, আর সে যদি নিরাপদ স্থানে জীবন নিয়ে বাঁচতে চায় তবে তাকে সেই খরস্রোতে গা ভাসিয়ে দিতে হবে; প্রখর স্রোত তাকে কোনও এক নিরাপদ স্থানে নিয়ে পৌঁছিয়ে দেবে। তেমনিভাবে খোদার অসীম ইচ্ছাশক্তির বিরুদ্ধে চলে মানুষ শান্তি পেতে পারে না। তাকে খোদার ইচ্ছাশক্তির নিকট পিপীলিকাটির ন্যায় আত্মসমর্পণ করে দিতে হবে। তবেই তার শান্তি লাভের আশা থাকবে।

সর্বশ্রেষ্ঠ, সার্বজনীন, সর্বশেষ ধর্ম ইসলাম খোদার ইচ্ছারই পূর্ণ প্রতিচ্ছবি। স্বর্গীয় সত্যসনাতন বাণী ইসলামের মাধ্যমে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে।[২] সুতরাং পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং পূর্ববর্তী ধর্মসমূহের অন্তর্নিহিত সত্য উদ্ঘাটন

এবং উন্নতিশীল মানব-গোষ্ঠীর নৈতিক ও আর্থিক চাহিদা পূরণ করার মহান দায়িত্ব নিয়ে ইসলাম অবতীর্ণ হয়েছে।

ইসলাম কেবল এর মতবাদ প্রচার করেই ক্ষান্ত নয়। প্রকৃত কাজের সাথে এর মতবাদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। এর মতবাদ কার্যে প্রতিফলিত হয়ে মানুষকে উন্নত হতে উন্নতর সোপানে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

ইসলাম পার্থিব জীবনের কর্মে বিশ্বাস করে। ইসলাম কেবল খোদার ইবাদতের নিয়মকানুন বা তাঁর দর্শন লাভের পথনির্দেশক বিষয়ে সীমিত নয়। ইসলাম বৈরাগ্যের ধর্ম নয়। দুনিয়ার সর্ববিধ কার্য সম্পাদনের মাধ্যমে খোদার উদ্দেশ্য সফল করে তোলাই এর লক্ষ্য। ইসলাম জাগতিক সমস্যাদির সমাধানকল্পে উত্তম পথের সন্ধান দিয়ে থাকে এবং মানুষে মানুষে সম্পর্ক, তার সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবন, ন্যায়বিচার, যুদ্ধবিগ্রহ বা শান্তি ইত্যাদি বিষয়েও এক উত্তম পথপ্রদর্শন করে থাকে।

## টীকা প্রসঙ্গ

১। কুরআন—সূরা ৫ঃ আয়াত ৩।

২। Muhammad Ali—The Religion of Islam.

## চতুর্থ অধ্যায়

# কুরআন

### কুরআনের তাৎপর্য

ইসলামী জীবনদর্শন বা আদর্শবাদ, এর নৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নীতিসমূহ এবং এর আইন-কানুন বা বিধিনিষেধ ইত্যাদির মূল আধার হলো কুরআন। মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনের দিকে লক্ষ্য রেখেই কুরআনের অবতারণা হয়েছিল। এ দুনিয়া সৃষ্ট-জগতের বিশাল কর্মক্ষেত্র; এ ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু পরকাল দীর্ঘস্থায়ী এবং অনন্ত। মানুষ কর্মময় জীবনের ফলাফল অনন্তকালে ভোগ করবে। ইসলাম উভয় জগতের সমন্বয় সাধন করেছে কর্মময় জীবনে ভাল কাজ দ্বারা মানুষ পৃথিবীতে আত্মিক সুখ উপভোগ করা ছাড়াও অনন্তকালে অনন্ত সুখের অধিকারী হবে। ভাল কাজ বলতে তৌহিদের মনোভাব নিয়ে নিজের এবং জাতিধর্ম নির্বিশেষে অপরের উপকার সাধন বোঝায়।

মহানবীর কর্মময় জীবনের সুদীর্ঘ তেইশ বছর ধরে কুরআন ক্রমে ক্রমে এবং বিভিন্ন সময়ে তাঁর ওপর অবতীর্ণ হয়েছিল। পবিত্র ফেরেশতা বা স্বর্গীয় দূত হযরত জিব্রাঈল (আঃ)-এর মাধ্যমে তিনি সর্বশক্তিমান খোদাতালার নিকট হতে প্রত্যক্ষভাবে কুরআনের বাণী লাভ করেছিলেন (২৬ : ১৯২—১৯৫)।

কুরআন আরবীতেই অবতীর্ণ হয়েছিল যাতে হযরত তা বুঝতে পারেন এবং ক্রমে ক্রমে লোকসমক্ষে তা পড়তে ও প্রচার করতে সমর্থ হন (২ : ৩ ; ১৭ : ১০৬)। কুরআন বিভিন্ন সময়ে আংশিকভাবে অবতীর্ণ হয়েছিল বটে; তবে তা সামগ্রিকভাবে একটি গ্রন্থ এবং একই ভাবে হযরত জিব্রাঈলের মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছিল।

কুরআন মানুষের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান দিয়েছে। তা হযরত মুহম্মদ (সঃ)-এর জীবদ্দশায় তেইশ বছরের মধ্যে প্রয়োজন অনুসারে কিছু কিছু করে তাঁর ওপর অবতীর্ণ হয়েছিল। যখন যে অংশ নাজেল বা অবতীর্ণ হতো তখন কোন সূরার কোন আয়াত কোন আয়াতের পরে বা পূর্বে বসবে তা হযরত জিব্রাঈল বলে দিতেন এবং তদনুসারে সাথে সাথে হযরত তা মুখস্থ করে নিতেন এবং ওহী লেখার কাজে নিযুক্ত সাহাবিগণ দ্বারা তা হাড়, চামড়া, খেজুরের ডালা প্রভৃতির ওপর লেখিয়ে নিতেন। এ ছাড়া তিনি প্রতি রমজান মাসেই অবতীর্ণ সমস্ত কুরআন হযরত জিব্রাঈলকে পড়িয়ে শুনাতেন। সাহাবিগণও নামাজে পড়ার জন্য এবং পবিত্র কালাম রক্ষা করার জন্য সাথে সাথে কুরআন মুখস্থ করে নিতেন। এভাবে হযরত আপন জীবদ্দশাতেই কুরআন লিখিয়ে নেন এবং রক্ষা করেন। অধিকন্তু বহু সাহাবীও কুরআন লিখে রেখেছিলেন। তবে হযরতের জীবদ্দশায় বরাবর কুরআন অবতীর্ণ হতে থাকায় লিখিত সমস্ত অংশ একত্র করে সাজিয়ে রাখা সম্ভবপর হয়ে ওঠে নি।

## কুরআনের সংকলন

হযরতের ইনতেকালের কিছুদিন পর য়ামামার যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং এতে বহু হাফেজ সাহাবী শহীদ হয়েছিলেন। এভাবে ভবিষ্যতে হাফেজ সাহাবীদের ধর্মযুদ্ধে মৃত্যুবরণ করতে হলে কুরআনের রক্ষণাবেক্ষণে বিঘ্ন সৃষ্টি হতে পারে ভেবে হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আবু বকরকে হাফেজদের সাক্ষাতে লিখিত আয়াতসমূহকে কিতাবাকারে সাজাতে অনুরোধ করেন। তদনুসারে খলীফা হযরত আবু বকর ওহীর লেখক এবং কুরআনের হাফেজ সাহাবী যায়েদ-বিন-সাবেত আনসারীকে ওমরের সহযোগিতায় তা সাজাবার ভার দেন। হযরত যায়েদ-বিন-সাবেতের নিকট তাঁর নিজস্ব কুরআনের নিখুঁত প্রতিলিপি ছিল; কুরআন তো তাঁর মুখস্থ ছিলই। তার ওপর তিনি সাহাবীদের লিখিত মূল প্রতিলিপিও সংগ্রহ করেছিলেন। যায়েদ লিখিত

প্রত্যেক আয়াতকে অন্ততঃ দুইজন হাফেজ সাহাবীর সাক্ষাতে কাগজে লিপিবদ্ধ করেন।

এভাবে পবিত্র কুরআন গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হওয়ার পর তা খলীফা হযরত আবু বকর (রাঃ), তারপর খলীফা হযরত ওমর (রাঃ), অতঃপর তাঁর কন্যা ও হযরতের সহধর্মিণী বিবি হাফসার নিকট রাখা হয় এবং বরাবর তা হতে জনসাধারণ নিজ নিজ পাঠের জন্য অনুলিপি করতে থাকে।

তৃতীয় খলীফা হযরত ওসমান (রাঃ)-এর সময় যখন তিনি জানতে পারলেন যে ইরাক, সিরিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে আঞ্চলিক ভাষা-বৈষম্যের দরুন কুর-আনের পঠননীতিতে বৈষম্য দেখা দিয়েছে, তখন তিনি হযরত হাফসার নিকট হতে মূল লিপিখানা আনিয়ে নেন। অতঃপর তিনি হযরত যায়েদ-বিন-সাবেত, আবদুল্লাহ্ বিন যুবাইর, সাইদ-বিন-আস এবং আবদুর রহমান বিন হারেসকে তার বিভিন্ন অনুলিপি করতে নির্দেশ দেন। যায়েদ ব্যতীত অন্য তিন জন কুরাইশ বংশসম্ভূত ছিলেন। তিনি তাদের বলে দিলেন যে, "যদি আপনাদের এবং যায়েদের মধ্যে কোন শব্দের উচ্চারণ ও বানান নিয়ে মতভেদ দেখা দেয় তবে কুরাইশদেরই রীতিতেই তা লিপিবদ্ধ করবেন। কেননা কুরআন তাদের ভাষায়ই অবতীর্ণ হয়েছে।" এভাবে কুরআনের ছয়, মতান্তরে সাত কপি অনু-লিপি প্রস্তুত করা হলো। খলীফা তার এক কপি মদীনায় রেখে দেন; বাকী কপিগুলি মক্কা, সিরিয়া, য়ামান, বসরা ও কুফায় এবং কারও মতে সপ্তম কপি বাহরাইনে পাঠিয়ে দেন এবং এর হুবহু অনুকরণ করতে জনগণকে বাধ্য করেন। এ সময় তিনি বিভিন্ন স্থানের লোকদের কাছ থেকে আগের অনুলিপিকৃত সমস্ত কপি সংগ্রহ করে জ্বালিয়ে দেন এবং চিরতরে কুরআন পাঠে মতভেদ দূর করে দেন। এ কারণেই হযরত ওসমান 'জামেউল-কুরআন' বা 'কুরআন একত্রকারী' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।

বর্তমানে মুসলিম জাহানে যে কুরআন প্রচলিত তা হযরত ওসমানের করানো বিশুদ্ধ অনুলিপিরই হুবহু নকল। অর্থাৎ তা হযরত মুহম্মদ (সঃ এর ওপর যে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছিল অবিকল তাই। এতে এক-

অক্ষরও বেশী বা কম নেই। অতঃপর কেউ কেউ কুরআনের আয়াত, শব্দ, অক্ষর এমনকি বিন্দুসমূহ পর্যন্ত গুণে পড়ে রেখেছেন।

পরবর্তীকালে মুসলিম জনগণ পড়ার সুবিধার জন্য কুরআনকে কয়েক প্রকার ভাগে বিভক্ত করেছেন। সপ্তাহে একবার পড়ার জন্য তাকে সাত মঞ্জিলে, মাসে একবার শেষ করার জন্য ত্রিশ পারায় এবং রমজান মাসে তারাবী নামাজে ২৭শে তারিখ রাত্রে কুরআন খতম বা শেষ করার উদ্দেশ্যে পাঁচ শত চল্লিশ রুকুতে বিভক্ত করা হয়েছে। এসব বিভাগ দ্বারা কুরআনের আসল পাঠের কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটে নি।[২]

কুরআনে একশত চৌদ্দটি সুরা বা অংশ রয়েছে। বিরানব্বইটি সুরা হযরতের নবুয়ত লাভের পর হতে তাঁর মক্কাজীবন-কালে অবতীর্ণ হয়েছিল। অবশিষ্ট বাইশটি সুরা হযরতের জীবনের বাকি দশ বছরে মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছিল। মদীনায় অবতীর্ণ সুরাগুলি একটু বড় এবং এগুলি কুরআনের প্রায় এক তৃতীয়াংশ স্থান অধিকার করে রেখেছে। মক্কায় অবতীর্ণ সুরাগুলিতে প্রধানতঃ আল্লাহর একত্ববাদ, নবুয়ত, এবাদত, কুফর, শিরক ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে এবং মদীনায় অবতীর্ণ সুরাগুলিতে উপরে উল্লিখিত বিষয় ছাড়াও পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রবিধান, বিধিনিষেধ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচিত হয়েছে।

হযরত ইবন্ আব্বাসের মতে পবিত্র কুরআনে ছয় হাজার ছয় শত ষোলটি বাক্য, পঁচাত্তর হাজার নয়শত চৌত্রিশটি শব্দ এবং তিন লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার ছয় শত একাত্তরটি অক্ষর রয়েছে।

## ধর্মগ্রন্থ হিসেবে কুরআনের অবদান

ধর্মগ্রন্থ হিসেবে কুরআন বিশ্বে এক অতি মূল্যবান অবদান রেখে গেছে। ধর্মের সমস্ত মৌলিক নীতি, খোদার একত্ব এবং অস্তিত্ব, মানুষের ভাল-মন্দ কাজের পুরস্কার বা শাস্তি, পরকালের জীবন, বেহেশত-দোজখ, খোদায়ী বাণী ইত্যাদির ওপর কুরআন যেমন বিশদভাবে আলোকপাত করেছে তেমন কোন ধর্মগ্রন্থ করে নি। এছাড়া মানুষের সম্পদ বণ্টন, বিশুদ্ধ যৌন সম্পর্ক এবং সুখ-সাচ্ছন্দ্য এবং উন্নতি বিধানের ক্ষেত্রে যে সব সমস্যা দেখা দিতে পারে পবিত্র কুরআনে তার সুস্পষ্ট সমাধান রয়েছে।

কুরআনের সবচেয়ে বড় অবদান পৌত্তলিকতার মূলোচ্ছেদ। পৌত্তলিক এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন আরবকে তা এক শতাব্দীর চতুর্থাংশ কালের মধ্যেই একই খোদার একনিষ্ঠ উপাসক করে তুলেছিল। কুরআনের শিক্ষার প্রভাবেই আরব পরিবার, সমাজ এবং জাতির ধ্যান-ধারণার এক বিপুল পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। একই খোদা, একই রসূল এবং একই কাবার ঐকতান শতধা বিচ্ছিন্ন আরববাসীকে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করে এক জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করেছিল। শৃঙ্খলা, সাম্য, মৈত্রী এবং ধর্মীয় জ্ঞানের পূতধারা ও জ্ঞানাকাঙ্ক্ষা তিমিরাচ্ছন্ন আরব সমাজকে উদ্ভাসিত করে তুলেছিল।

## আরবী সাহিত্য-ক্ষেত্রে কুরআনের স্থান

আরবী সাহিত্যে কুরআনের অবদান অপরিসীম। কুরআনকে প্রধান কেন্দ্র করেই এক শক্তিশালী আরবী সাহিত্য গড়ে উঠেছিল। কুরআনের সুবিন্যস্ত ও শক্তিশালী রচনা, ভাষা ও ভাবগাম্ভীর্য, গদ্য পদ্যের আশ্চর্য রচনের সংমিশ্রণ, জ্ঞানগর্ভ উপদেশ ও নীতিমূলক বাক্যাবলী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। ডঃ স্টেইনগেস বলেন যে, কুরআন কেবল আরবী সাহিত্যের উন্নতির সূচনা করেনি, তা চলতি কবিতার সঙ্গে গদ্য ও অলংকার-বিদ্যার যোগসাধন করে সব সাহিত্যের উন্নতির পথ সুগম করে দিয়েছিল। যে সব সূরায় মুসলমানদের ব্যক্তিগত ও সমাজগত জীবন পরিচালন সম্পর্কে নির্দেশ রয়েছে ঐ সমস্ত সূরার সংবোধন গদ্য সাহিত্যের নমুনা বিদ্যমান রয়েছে।[১]

"কুরআনের ভাষার পদ্ধতি সাধারণতঃ সুন্দর এবং প্রাঞ্জল; কুরআন দ্বারা হযরত এত অদ্ভুতভাবে তাঁর শ্রোতাদের মন আকর্ষণ করতে সমর্থ হতেন যে তাঁর বহু শত্রু আশ্চর্যান্বিত হয়ে তাতে যাদুমন্ত্রের প্রভাব বিদ্যমান ছিল বলে মনে করতো।[২]

বস্তুতঃ কুরআন পড়ার সাথে সাথেই কুরআনের সাবলীল ভাষা ও মধুর ঝঙ্কার মানুষের মনকে বিগলিত করে। তাই তা মানুষকে যাদু-মন্ত্রের ন্যায় মুগ্ধ করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতে অনুপ্রাণিত করেছিল বলে

বহু ইসলাম বিরোধী খৃস্টান ধর্মযাজক আক্ষেপ করে বলে থাকতেন।[৫] "কুরআন তার বুঝাবার শক্তি, বাগ্মিতা এবং এমন কি তার বাক্য গঠনের দিক দিয়ে সত্যই অতুলনীয়, ...... পরোক্ষভাবে কুরআনের বদৌলতেই মুসলিম জগতে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার চমৎকার উন্নতি সাধিত হয়েছিল।"[৬]

টীকা প্রসঙ্গ ও গ্রন্থালোচনা

১। হযরত জিব্রাঈলের মাধ্যমে হযরত মুহম্মদ (সঃ)-এর পূর্ববর্তী নবীদের নিকটও একই রকমে খোদার বাণী অবতীর্ণ হয়েছিল (৪ : ১৬৩)। জিব্রাঈল (আঃ)-কে কুরআনের কোথাও 'পবিত্র আত্মা' এবং 'বিশ্বস্ত 'আত্মা' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। (২৬ : ১৯২—১৯৫ ; ১৬ : ১০২)। ইসায়ী ও ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থে এই 'পবিত্র আত্মা' (Holy Spirit)-র মাধ্যমে তাদের নবীদের অনুপ্রেরণা লাভের কথা বলা হয়েছে।

২। আল ইতকান

৩। Hughes—Dictionary of Islam.

৪। Sale-Translation of the Quran—Preliminary Discourse.

৫। Arnold—The Preaching of Islam.

৬। Hirschfeld—New Researches.

পঞ্চম অধ্যায়

# হাদীস বা সুন্নাহ্

ইসলামী আদর্শবাদ ও আইন-কানুন ইত্যাদির দ্বিতীয় উৎস হলো সুন্নাহ্ বা হাদীস। সুন্নাহ্ বলতে মহানবীর কাজ এবং হাদীস বলতে তাঁর অমূল্য অমীয় বাণীকেই বুঝায়। তবে সাধারণতঃ সুন্নাহ এবং হাদীস একই অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তাই মহানবী তাঁর নবী-জীবনে যা বলেছিলেন, করেছিলেন বা অন্যের কোন কথা ও কার্যের প্রতি যে সম্মতি জ্ঞাপন করেছিলেন সে সবকেই সাধারণভাবে সুন্নাহ্ বা হাদীস বলা হয়ে থাকে।

## সুন্নাহ্ বা হাদীসের গুরুত্ব

সুন্নাহ্ বা হাদীসের গুরুত্ব অপরিসীম। হযরতের কথা এবং কার্যের দ্বারা কুরআনের বর্ণনা বা বিধিনিষেধ লোকসমাজে বোধগম্য হয়েছে। এ দিক দিয়ে বিবেচনা করলে হাদীসকে কুরআনের ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ বলা যেতে পারে। যেমন, কুরআনে সাধারণভাবে নামাজ পড়ার এবং যাকাত দেওয়ার নির্দেশ রয়েছে; কিন্তু কিভাবে এবং কখন নামায পড়তে হবে এবং কি ভাবে কাকে যাকাত দিতে হবে ইত্যাদি বিষয় হযরত মুহম্মদ (সঃ) বিশদভাবে কাজে এবং কথায় ব্যক্ত করেছেন। প্রসিদ্ধ ইসলামী আইনবিদ হযরত আবূ হানিফা বলেছেন, সুন্নাহ্ না হলে আমাদের কেউ কুরআন বুঝতে সক্ষম হতো না।[১]

সাহাবীদের যুগ হতে বর্তমান যুগ পর্যন্ত দুনিয়ার সকল মুসলমানই রাসূলুল্লাহর সুন্নার হুকুম পালন করা অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করে; কেননা আল্লাহ্র কিতাব যেমন ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা বা শরীয়তের একটি উৎস, রাসুলুল্লাহর সুন্নাহও এর অপর একটি উৎস। আর

কিতাব ও সুন্নাহ মিলেই রচিত হয়েছে ইসলামী শরীয়ত-জীবন-ব্যবস্থার নিয়ম-কানুন।

পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা ছাড়াও পার্থিব এবং পারলৌকিক মানবীয় বহুবিধ সমস্যার সমাধান হযরতের কাজে এবং বাণীতে রয়েছে। হাদীসের গুরুত্ব উল্লেখ করে ভারতীয় উপমহাদেশের অনন্যসাধারণ ধর্মবিশারদ হযরত শাহ্ ওয়ালি উল্লাহ্ বলেছেন, সন্দেহবর্জিত জ্ঞান এবং ধর্ম সম্পর্কীয় যাবতীয় জ্ঞান ও বিজ্ঞানসমূহের মধ্যে হাদীস-বিদ্যা সব কিছুর মূলাধার এবং শীর্ষ স্থানীয়।

শেষ নবী হযরত মুহম্মদ (সঃ) যা কিছু বলেছেন, করেছেন এবং অপরের যে সব কথা ও কাজ তাঁর সমর্থন লাভ করেছে, তার সবই হাদীস শাস্ত্রে সন্নিবেশিত রয়েছে। বস্তুতঃ এ দিক থেকে হাদীস অন্ধকারে প্রদীপ এবং পথপ্রদর্শনের ক্ষেত্রে আলোকস্তম্ভস্বরূপ। যে ব্যক্তি তা অনুসরণ করে তদনুযায়ী কাজ করেছে সেই সৎপথের সন্ধান লাভ করেছে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তা করে নি সে নিঃসন্দেহে পথভ্রষ্ট ও ব্যর্থকাম হয়েছে।[৩]

## সাহাবীদের নিকট সুন্নাহ্‌র তাৎপর্য

মহানবীর সাহাবীদের মধ্যে সবাই সুন্নাহ্‌কে ইসলামী শরীয়তের একটি উৎস বলে মনে করতেন। তাঁদের সামনে যখনই কোন সমস্যা দেখা দিত তখনই তাঁরা প্রথমে কুরআনে এর সমাধান খুঁজতেন এবং অতঃপর রসূলুল্লাহ্‌র সুন্নাহ্‌তে তা তালাশ করতেন। খোলাফায়ে রাশেদীনও তাই করতেন। তাঁরা কোন বিষয় সুন্নাহ্‌র অনুসন্ধান না করে কোন বিষয়ে হাত দিতেন না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, রসূলুল্লাহ্‌র মৃত্যুর পর তাঁকে কোথায় দাফন করা হবে এ নিয়ে যখন সাহাবীদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয় হযরত আবু বকর তখন রসূলুল্লাহ্‌র এক হাদীসের উল্লেখ করে সবাইকে শান্ত করেন। হাদীসটি হলো —"নবীগণ যেখানে সমাধিস্থ হতে ভালবাসেন সেখানেই খোদাতালা তাঁদের মৃত্যু ঘটান" (—তিরমিজী ও মোয়াত্তা)। হযরত ওমর, হযরত ওসমান এবং হযরত আলী এ নিয়মেরই অনুসরণ করেছিলেন।

## মহানবীর সময় হাদীস সংরক্ষণ

হযরত রসূলুল্লাহ্‌র সময় সাধারণতঃ মৌখিক বর্ণনার মাধ্যমে হাদীসের চর্চা হতো ; কেননা কুরআনের বাণীর সঙ্গে সাহাবীদের লেখার মাধ্যমে হাদীস মিশ্রিত হয়ে পড়ার আশংকায় হযরত তাঁদের হাদীস লিখতে সাধারণভাবে বারণ করেছিলেন। এ ছাড়া তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, যদি তাঁর হাদীসসমূহ কুরআনের ন্যায় সম্যকভাবে এবং সমান গুরুত্ব সহকারে কিতাবাকারে লেখা হয় তবে পরবর্তী কালে তাঁর অনুসারিগণ একে কুরআনের সমমর্যাদা দান করতে হয়তো কুণ্ঠাবোধ করবে না। তবে সাহাবীদের মধ্যে কেউ কেউ হাদীস লিখার অনুমতি হযরতের নিকট হতে লাভ করেছিলেন বলেও জানা যায়। তাঁদের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ-বিন আমর, হযরত আলী (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ বিন-মাসউদ প্রমুখ রয়েছেন। সম্ভবতঃ হযরত লেখার অনুমতি তাঁদেরই দিয়েছিলেন যাঁদের স্মরণশক্তি তেমন তীব্র ছিল না এবং তাই তাঁদের পক্ষে ভুলে যাওয়ার আশংকা থাকতো। অথবা হাদীস লেখা সে সময়ে নিষেধ করা হয়েছিল যে সময়ে লিখিত হাদীস কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময়কালে কুরআনের আয়াতের সঙ্গে মিলে যাওয়ার আশংকা ছিল।[৮]

হযরতের কাছ থেকে সরাসরিভাবে অথবা অন্য সাহাবীদের মাধ্যমে হাদীস বর্ণনা করেছেন এমন সাহাবীদের সংখ্যা ছিল (ইমাম রাজীর মতে) এক লক্ষ চৌদ্দ হাজার।[৫] হযরতের ইন্তেকালের সময় কেবল মক্কা ও মদীনায় সাহাবীদের সংখ্যা ছিল (ইমাম শাফেয়ীর মতে) ষাট হাজার।[৬] সাহাবীদের মধ্যে অনেকেই অসাধারণ স্মরণশক্তির অধিকারী ছিলেন। এক একজন কয়েক হাজার হাদীস মুখস্থ করে রাখতে পারতেন। হাফেজে হাদীস বা হাদীস মুখস্থকারী সাহাবীদের মধ্যে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস প্রমুখ বিশেষ প্রসিদ্ধ। তাঁরা প্রায় সর্বক্ষণ হযরতের সঙ্গে ছায়ার মতো থাকতেন এবং তাঁর অমীয় বাণীগুলো মুখস্থ করে ফেলতেন। হযরত আবু হোরায়রা প্রায় ৫৩৭৪টি হাদীস হযরতের কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন। এত অধিক সংখ্যক হাদীস সাহাবীদের মধ্যে অন্য কেউ

বর্ণনা করেন নি। তিনি অসাধারণ স্মরণশক্তির অধিকারী ছিলেন। সপ্তম হিজরীর প্রথম দিকে তিনি মদীনা এসেছিলেন। তখন তাঁর বয়স ছিল প্রায় ত্রিরিশ বছরের ঊর্ধ্বে। সে সময় হতে তিনি অনুক্ষণ হযরতের সাথে থাকতেন। হযরত ইবনে আব্বাসের স্মরণশক্তিও ছিল অত্যন্ত প্রখর। তাঁর প্রমুখাৎ প্রায় ১১৬০টি হাদীস বর্ণিত আছে।

## হাদীস সংকলন

হযরতের ইন্তেকালের পর সাহাবীদের মধ্যে কোন মীমাংসার আবশ্যক হলে তাঁরা হযরতের কথা, কাজ বা অনুমোদন ইত্যাদি আলোচনা করে মতামত ব্যক্ত করতেন। তাঁরা রসুলাল্লাহর জীবদ্দশাতেই যে কেবল হাদীস সংরক্ষণ এবং হাদীসের প্রচার করতেন তা নয়; তাঁর অন্তর্ধানের পর তাঁদের তৎপরতা বরং বহু গুণে বেড়ে গিয়েছিল। কোন কোন সাহাবী অপর সাহাবীর কাছ থেকে হাদীস সংগ্রহ করার জন্য শত শত মাইল দূরে পর্যন্ত বহু কষ্ট স্বীকার করে চলে যেতেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, হযরত আবু আইয়ুবের ন্যায় একজন প্রবীণ এবং বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী সাহাবী কেবলমাত্র একটি হাদীসের জন্য মদীনা হতে মিসরে সফর করেছিলেন এবং সেখানে ওকবাহ-বিন-আমরের কাছ থেকে এর সত্যতা যাচাই করে আসেন। এরূপ বহু সাহাবী দূর-দূরান্তরে গিয়ে যথার্থভাবে হাদীস সংগ্রহ করেছিলেন। এ-সব সাহাবীর অক্লান্ত পরিশ্রম এবং দীর্ঘ দিনের সাধনার ফলে বহু হাদীস সংগৃহীত হয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল।

## হিজরী প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে হাদীস গ্রন্থ রচনা

হিজরী প্রথম শতক হতে হাদীস সংগ্রহ, লিখন ও পঠনের কাজ পূর্ণোদ্যমে শুরু হয়। তবে প্রথম শতকের সংকলিত হাদীসগুলি বিশেষ বিশেষ বিষয়ে সীমিত ছিল; সেগুলি সকল বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত ছিল না। ইমাম মালেক (মৃঃ ১৭৯ হিঃ) দ্বিতীয় শতকে পুস্তাকাকারে সর্বপ্রথম হাদীস গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাঁর গ্রন্থের নাম হলো 'মোয়াত্তা'।

এরপর ইমাম মুহম্মদ-ইবন-ইদরীস আশশাফি (মৃঃ২০৪ হিঃ) প্রকাশ করেন তাঁর 'মসনদ' গ্রন্থ এবং তারপর প্রকাশিত হয় ইমাম আহমদের (মৃঃ ২৪১ হিঃ) 'মুসনদ'।

ইমাম মালেক মদীনায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন (হিঃ ৯৩ ঃ ৭১১ ইং)। তিনি কখনও মদীনার বাইরে যেতেন না। তিনি অসাধারণ মণীষা সম্পন্ন লোক ছিলেন। তিনি হাদীসের প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করতেন। খলীফা হারুনুর রশীদ তাঁর পুত্র আমীন ও মামুনকে ইমাম মালেকের বাড়ীতে রেখেই শিক্ষা দিয়েছিলেন। ইমাম মালেকের লিখিত 'মোয়াত্তা' একটি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। তা তাঁর দীর্ঘ চল্লিশ বছরের সাধনার ফল।

ইমাম আশশাফি ইমাম মালেকের সহচর ছিলেন। তিনি অসাধারণ মেধাবী ছিলেন এবং জ্ঞানান্বেষণে দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করেছিলেন তিনি শেষ জীবনে মিসরেই কাটিয়েছিলেন। তিনি প্রায় ১১৪টি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। সেগুলোর মধ্যে তাঁর ফেকাহ্ শাস্ত্র গ্রন্থ 'কিতাবুল উম্মই' সমধিক প্রসিদ্ধ। এতে বহু হাদীস রয়েছে। 'মুসনাদ' তাঁর একটি স্বতন্ত্র হাদীসের গ্রন্থ।

ইমাম আবু আবদুল্লাহ অহমাদ-বিন-হাম্বাল বাগদাদের অধিবাসী ছিলেন (হিঃ ১৬৪—২৪১)। হাদীস সংরক্ষণের ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতেন। তিনি কারও কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করতেন না। তিনি অতি দীনভাবে জীবনের ৭৮টি বছর কাল কাটিয়ে গিয়েছেন। তিনি সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার হাদীস সংগ্রহ করে তাঁর 'মুসনাদ' লিখতে বসেন এবং ত্রিশ হাজারের কিছু অধিক হাদীস তাঁর কিতাবে স্থান দেন। মুসনাদসমূহের মধ্যে তাঁর কিতাবই সর্ববৃহৎ এবং সর্বাপেক্ষা সহীহ্ বা নির্ভরযোগ্য।

## হিজরী তৃতীয় শতকের হাদীস গ্রন্থ

হিজরী তৃতীয় শতকে অধিকতর উদ্যোগের সাথে হাদীস সংগৃহীত, লিখিত এবং পঠিত হতে থাকে। এ সময়কে হাদীস গ্রন্থ রচনার একটি

স্বর্ণযুগ বলে মনে করা হয়ে থাকে। এ যুগের হাদীস গ্রন্থের মধ্যে ইমাম বুখারীর (মৃঃ হিঃ ২৫৬) 'আল-জামী ইস্-সহীহ্,' ইমাম মুসলিমের (মৃঃ হিঃ ২৬১) 'সহীহ্,' ইমাম আবু দাউদের (মৃঃ হিঃ ২৭৫) 'সুনান' ইমাম তিরমিজীর (মৃঃ হিঃ ২৭৯) 'জামী' ইমাম নাসাইর (মৃঃ হিঃ ৩০৩) 'সুনান' ইমাম ইবনে মাজাহ্‌র (মৃঃ হিঃ ৩৭৩) 'সুনান' ইমাম দারিমীর (মৃঃ হিঃ ২৫৫) 'সুনান' প্রসিদ্ধ। এই হাদীসগুলির মধ্যে প্রথম ছয়টি সমষ্টিগতভাবে সিহাহ্‌ সিত্তাহ্‌, বা ছয়টি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ বলে খ্যাত। ইমাম বোখারী এবং ইমাম মোসলেমের দু'টি গ্রন্থকে সহীহান বা দু'টি নির্ভুল হাদীস গ্রন্থ বলা হয়ে থাকে।

উপরুল্লিখিত হাদীসবেত্তাগণ হাদীসের সত্যতা যাচাই করে তাদের সংগৃহীত হাদীস গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। অতঃপর এমন কোন হাদীস কারও নিকট রয়েছে বলে অনুমান করা যায় না যা কোন-না-কোন হাদীস গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয় নি।

সিহাহ্‌ সিত্তার কিতাবসমূহ সেগুলোর আসল নামে প্রসিদ্ধ না হয়ে তাদের রচয়িতাদের নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে; যেমন বোখারী শরীফ, মোসলেম শরীফ ইত্যাদি।

## ইমাম বোখারী

সিহাহ্‌ সিত্তাহ্‌ হাদীস গ্রন্থ রচনাকারীদের মধ্যে ইমাম বোখারী সর্বোচ্চ স্থান লাভ করেছেন। অন্যান্য প্রায় সব হাদীস গ্রন্থকার তাঁকে অনুসরণ করে তাঁদের গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি সবচেয়ে বেশী সমালোচনার ভাব নিয়ে তাঁর গ্রন্থ রচনা করেছেন। যাঁদের নিকট হতে তিনি হাদীস সংগ্রহ করতে চেয়েছিলেন তাঁরা নির্ভরযোগ্য না হলে তিনি তাঁদের বর্ণনা গ্রহণ করেন নি; একজন বর্ণনাকারী অপর বর্ণনা-কারীর মুখ হতে হাদীস শুনে না থাকলে তিনি তাঁর বর্ণনা গ্রহণ করেন নি; যে-কোন বর্ণনাকারী কেবল অপর জনের সমকালীন লোক হলে তাঁর নিকট তাঁর বর্ণনা গ্রহণযোগ্য ছিল না। তিনি তাঁর গ্রন্থের অত্যাবশ্যক ও অতি মূল্যবান অধ্যায়গুলির সূচনাতেই কুরআনের অংশ-

বিশেষ উদ্ধৃত করেছেন। এতে হাদীস যে কুরআনেরই ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ তা বুঝাচ্ছে এবং সে জন্যেই ইসলামী শিক্ষার উৎস হিসেবে হাদীস দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে।

ইমাম বোখারী ছয় লক্ষ হাদীস হতে বাছাই করে মাত্র দুই হাজার সাত শত একাত্তরটি হাদীস তাঁর গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন। তিনি দীর্ঘ ষোল বৎসর হাদীস বাছাই কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁর এই গ্রন্থ এতই মূল্যবান বিবেচিত হতো যে কেবল তাঁর নিকট প্রায় নব্বই হাজার লোক তা অধ্যয়ন করেছিলেন।[৮] আজও মুসলিম বিশ্বের এমন কোন স্থান নেই যেখানে সহীহ্ বোখারী শরীফ শিক্ষা দেয়া হয় না; মুসলিম জনসাধারণ কুরআনের পরেই এর স্থান দিয়ে থাকে।

## সহীহ্ মুসলিম

ইমাম মুসলিম তিন লক্ষ হাদীস হতে বাছাই করে মাত্র চার হাজার হাদীস তাঁর গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর এ কাজে তিনি সুদীর্ঘ পনের বছর কাল অতিবাহিত করেছিলেন। তাঁর হাদীস বিন্যাস অতি চমৎকার। প্রত্যেক বিষয়ের সমস্ত হাদীসের খুঁটিনাটি বিচার করে প্রথমে হাদীসের পারম্পরিক স্থান নির্ণয় করেছেন; অতঃপর প্রতিটি হাদীসকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করেছেন। এজন্য বিশুদ্ধতায় বোখারী শরীফ প্রথম এবং হাদীসবিন্যাসে মুসলিম শরীফ প্রথম বলে কেউ কেউ মন্তব্য করে গেছেন।

### টীকা প্রসঙ্গ ও গ্রন্থালোচনা

১। মীজানে শা'রানী।

২। হযরত শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্—হুজ্জতুল্লাহিল বালেগাহ্।

৩। ঐ

৪। মেশকাত—হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস- মওলানা নূর মুহম্মদ আজমী।

৫। ঐ

৬। ঐ

৭। তাবাকাতে ইবনে ইছাবাহ।

৮। মেশকাত—হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস (মওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী)।

ষষ্ঠ অধ্যায়

# ইজমা ও কেয়াস, ইজতেহাদ

পূর্বেই বলা হয়েছে যে ইসলামী আইন-কানুনের মূলাধার হলো পবিত্র কুরআন এবং হাদীস; অতঃপর ইজমা ও কেয়াস।

## ইজতেহাদ

ইসলামী সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির সাথে সাথে মুসলমানদের মধ্যে নানাবিধ সমস্যা দেখা দিতে থাকে। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির লোকের মধ্যে বিভিন্ন রকমের নিয়ম-কানুন বা রীতিনীতি প্রচলিত ছিল। এ পরিপ্রেক্ষিতে কোন্ কোন্ বিষয় ইসলামের পরিপন্থী এবং কোন্ কোন্ বিষয় ইসলামসম্মত তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা আবশ্যক হয়ে পড়েছিল। তাই নবী করিমের সাহাবিগণ, সাহাবীদের শিষ্যগণ (তাবেয়ীন) ও প্রশিষ্যগণ (তাবেতাবেয়ীন) এবং তাঁদের পরবর্তী কালের বহু ধর্মীয় আইন-বিশারদ গভীরভাবে কুরআন-হাদীসের গবেষণা করে নব উদ্ভূত সমস্যাদির সমাধান করতেন। তাঁদের এ ধরনের গবেষণাকে বা জ্ঞানলাভের প্রচেষ্টাকে ইজতেহাদ বলা হতো এবং যিনি এতে দক্ষতা অর্জন করতে সমর্থ হতেন তাঁকে মুজতাহীদ বলা হতো।

## ইজমা

শরীয়ত বা ইসলামী কানুন সম্পর্কের কোন নতুন সমস্যা সমাধানের পরিপ্রেক্ষিতে যে কোন যুগের মুজতাহীদদের ঐক্যমতকে ইজমা বলা হয়ে থাকে। মুজতাহীদদের ঐক্যমতভিত্তিক যে কোন মীমাংসা ইসলাম-জগতের সকল মুসলমানের পক্ষে অবশ্য গ্রহণীয়।

## কেয়াস

ইজতেহাদ সাধারণ কেয়াসের মাধ্যমেই সম্পাদিত হয়ে থাকে। কোনও নতুন সমস্যার মীমাংসার জন্য কুরআন ও হাদীসে প্রদত্ত মীমাংসাকে ভিত্তি করে যুক্তি প্রয়োগ দ্বারা সমস্যা সমাধান করে দেওয়ার নিয়মকে কেয়াস বলা হয়ে থাকে। সাহাবিগণ এবং তাঁদের শিষ্য-প্রশিষ্যদের নিকট কোনও নতুন সমস্যা দেখা দিলে তাঁরা যুক্তি দ্বারা কুরআন ও হাদীসে মীমাংসিত সদৃশ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। যেমন নবী করিমের সময় আঙ্গুরের মদ প্রচলিত ছিল এবং এর মাদকতা মানুষের পক্ষে অনিষ্টকর বলে কুরআনে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালে মুজতাহীদগণ কুরআনে উল্লিখিত শরাবের যুক্তি পেশ করে সব মাদক দ্রব্য নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেন। তাই নতুন সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে কুরআনের বিধান জনকল্যাণ সাধনার্থেই সম্প্রসারিত হতে লাগলো। মুজতাহীদদের মধ্যে মতানৈক্য থাকতে পারে এবং এক যুগের মুজতাহীদদের রায় অন্য যুগে পরিবর্তিত হতে পারে।

## মযহাব

মুজতাহীদদের মধ্যে হিজরী দ্বিতীয় শতকে চার জন মুজতাহীদ এতই প্রসিদ্ধি ও স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন যে তাঁদের রায় ধর্মীয় জীবন যাপনে মুসলিমদের অবশ্য পালনীয় বলে বিবেচিত হতো। তাঁদের যুক্তিপূর্ণ ইজতেহাদ মুসলিম জাতিকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল। ফলে আজও পৃথিবীর অধিকাংশ মুসলমান তাঁদের কোন-না-কোন জনের নির্দেশিত পথের অনুসারী। নামায, রোজা, বিবাহ, তালাক, ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি বিষয়ের নিয়ম-কানুন পালন-বিধি নিয়েই কেবল তাঁদের মধ্যে সামান্য বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। এ ধরনের কার্যসম্পাদন (আ'মাল) বিষয়ক মতবাদকে মযহাব বলা হয়ে থাকে। উক্ত চার জন ধর্মীয় বা ফিকাহ শাস্ত্রে এবং ইজতেহাদে সর্বোচ্চ স্থান লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন বলে তাঁদের ইমামও বলা হয়ে থাকে। নিম্নে তাঁদের পরিচয় দেয়া হলো।

**ইমাম আবু হানিফা (মৃঃ ১৫০ হিঃ)** ঃ তিনি ইরাকের অন্তর্গত কুফার অধিবাসী ছিলেন। তাঁর মযহাব হানাফী মযহাব নামে পরিচিত। বর্তমানে তুরস্ক, ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও মধ্য-এশিয়ার বহু দেশের মুসলমানগণ তাঁরই মযহাবের অন্তর্গত।

**ইমাম মালিক (মৃঃ ১৭৯ হিঃ)** ঃ তিনিও একজন প্রসিদ্ধ হাদীসবেত্তাও ছিলেন। তিনি মুজতাহীদ হিসেবে সুপরিচিত এবং তাঁর মযহাব মালিকী মযহাব নামে সুবিদিত। বর্তমানে মক্কা, মদীনা, পশ্চিম আফ্রিকা, উত্তর মিসরের অধিকাংশ অঞ্চল এবং জর্ডান নদীর পশ্চিমের অঞ্চলের অধিকাংশ মুসলমান এই মযহাবের অনুসারী।

**ইমাম শাফী (মৃঃ ২০৪ হিঃ)** ঃ ইনি মক্কার অধিবাসী ছিলেন। তিনি কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর নাম মুহম্মদ বিন ইদরিস। তিনি ইমাম মালেকের ছাত্র ছিলেন; তবে মুজতাহীদ হিসেবে তাঁর মৌলিক অবদান ছিল। বর্তমানে মিশর, সিরিয়া, দক্ষিণ আরব, পূর্ব আফ্রিকা ও ইন্দোনেশিয়ায় তাঁর মযহাবের অনুসারী রয়েছে।

**ইমাম আহমদ ইবন হাম্বাল (মৃঃ ২৪১ হিঃ)** ঃ ইনিও হাদীস বেত্তা হিসেবে ইমাম মালিক বা শাফীর ন্যায় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। মুজতাহীদ হিসেবেও তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। মুসলিম জাহানে তাঁর মযহাবেরও বহু অনুসারী রয়েছে। তিনি ইমাম শাফেঈর শিষ্য ছিলেন। তাঁর মতবাদ হাম্বালী মযহাব নামে খ্যাত। তাঁর মযহাব অষ্টম হিজরী পর্যন্ত ইরাক, মিসর, সিরিয়া, ফালাস্তীন প্রভৃতি স্থানে প্রচলিত ছিল। বর্তমানে কেবল আরবেই প্রচলিত রয়েছে।

প্রত্যেক মযহাবের ইমামদের জ্ঞান-পাণ্ডিত্য, ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং চারিত্রিক গুণাবলীর দরুন তাঁরা সকলেরই শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসভাজন হয়েছিলেন। চার মযহাবের ইমামদের প্রতি বিশ্বের মুসলিম জনসাধারণের এমন অসাধারণ ভক্তি রয়েছে যে, এক মযহাবের লোক অন্য মযহাবকেও শ্রদ্ধার চোখে দেখে থাকে এবং ভিন্ন মযহাবের লোকের পেছনে নামাজ পড়তেও তারা কুণ্ঠাবোধ করেন না এবং তা জায়েজ বলে মনে করে থাকেন।

চার মযহাবের মুসলমানগণ ছাড়াও আহ্‌লে হাদীস নামে আর একটি জামাআতও আছে। তাঁদের মতে, যাঁরা কুরআন-হাদীস বুঝবার ক্ষমতা রাখেন তাঁরা সরাসরি কুরআন অনুসরণ করে চলতে পারেন; যাঁদের বুঝবার ক্ষমতা নেই তাঁরা তাঁদের ইচ্ছানুসারে যে-কোনও মুজতাহীদকে অনুসরণ করে চলতে পারেন।

## ইজতেহাদের গুরুত্ব

ইজতেহাদই ইসলামের প্রাণ। তা না হলে ইসলাম নিশ্চল হয়ে থাকতো। মযহাবের ইমামদের ইজতেহাদের দরুন ইসলাম যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে টিকে থাকতে পেরেছিল। এর দ্বারাই প্রমাণিত হয়েছে যে ইসলাম নিশ্চল নহে, গতিশীল (Dynamic and not static)। বিশ্বের মানবমণ্ডলীকে নিয়ে এক মহাজাতি গঠন করাই ছিল ইসলামের উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য সফল করে তুলতে হলে ইজতেহাদের প্রয়োজন ছিল। তাই ইসলামের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির সাথে সাথে যখন বহুমুখী সমস্যা দেখা দিতে লাগলো তখন কুরআন এবং সুন্নার আলোতে এগুলোর সমাধান-মূলক ব্যবস্থা গৃহীত হতে লাগলো। কুরআন ও হাদীস দক্ষ এমন সব ফকিহ্ বা ধর্মীয় আইন বিশারদ তাঁদের প্রচেষ্টা দ্বারা নতুন সমস্যাদির মুকাবিলা করে এগুলোর সমাধান দিতে থাকেন। ফলে ইসলামী জীবন-ধারায় গতিশীল নীতি প্রবর্তিত হতে থাকে। এ নীতি নবী করিমের সাহাবী, সাহাবীদের শিষ্য এবং তাঁদের পরে ধর্মীয় শাস্ত্রবিদদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল।

কতকগুলি বিশেষ কারণের দরুন ইজতেহাদ বা প্রচেষ্টার গতি হিজরী তৃতীয় শতকের পর হতে কিছু শিথিল হয়ে এসেছে। প্রথমতঃ, আব্বাসীয় খিলাফতের যুগে ধর্মক্ষেত্রে মুতাযিলা সম্প্রদায়ের অতি মাত্রায় শুষ্ক যুক্তিবাদ মুসলিম সমাজে তিক্ত বিতর্কের সৃষ্টি করতে থাকে। দ্বিতীয়তঃ, সুফী মতবাদ এর চরমে পৌঁছে বাহ্যিক জগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এমন সব কিছুর প্রতি ঔদাসীন্যের মনোভাব দেখাতে থাকলে সমাজে বিরূপ প্রতি-ক্রিয়ার সৃষ্টি হতে থাকে। তৃতীয়তঃ, গ্রীক-দর্শনের প্রভাবের ফলে মানুষ

কুরআন এবং সুন্নাহ্ হতে কিছু দূরে সরে পড়তে থাকে এবং অবশেষে ১২৫৮ খ্রীস্টাব্দে মুসলিম জগতের কেন্দ্রস্থল বাগদাদ নগরীর পতন হলে ইসলামের ভবিষ্যত সম্পর্কে মুসলিম জাহান শঙ্কিত হয়ে পড়ে।[১] এসব নানাবিধ কারণে ধর্মীয় নেতাগণ সর্বপ্রথম শরীয়তের চার ইমামের বাঁধাধরা মযহাবে আশ্রয় নিতে থাকেন। তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সমাজে শৃংখলা রক্ষা করা। তখনও কোন সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে চার ইমামের নির্ধারিত রায়ই যথেষ্ট ছিল বলে তাঁরা মনে করতেন। বিশেষ করে হযরত আবু হানিফা (রাঃ) ভবিষ্যতে যে সব সমস্যা দেখা দিতে পারে পূর্বেই তা অনুমান করে সে সবের সমাধান দিয়ে গেছেন। এতেও ইজতেহাদের প্রয়োজনীতা কমে গিয়েছিল। এ ছাড়া তুর্কী খিলাফতের পতন এবং শিল্প বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত মুসলমানদের জীবনধারার তেমন কোন পরিবর্তন সংঘটিত না হওয়ায় কোন নতুন বিষয় নতুনভাবে চিন্তা করার প্রয়োজনীয়তাও দেখা দেয় নি।

## ইজতেহাদের আশু প্রয়োজনীয়তা

উপরে বর্ণিত কারণসমূহের দরুন ইজতেহাদের গতি শিথিল হয়ে গেলেও এর পথ সব সময়ের জন্য খোলা রয়েছে। বর্তমান সমস্যা-সঙ্কুল ইসলাম জগতে ইজতেহাদের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। পবিত্র কুরআন এবং বিশেষ করে হাদীসে যে যুক্তি ও বিচারবুদ্ধি দ্বারা প্রচেষ্টার কথা পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে, তাতে কোন বিশেষ যুগের উল্লেখ নেই; সর্বকালের জন্যই তা প্রযোজ্য। মহানবী মোয়ায ইবনে জাবালকে য়ামানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে তাঁর কাছে জানতে চেয়েছিলেন, যখন সেখানে শাসনক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেবে তখন তিনি কিভাবে তার সমাধান করবেন। হযরত মায়ায উত্তরে বলেছিলেন, "আল্লাহ্‌র কিতাবের নির্দেশ মেনে চলবো।" নবী করিম তখন বললেন, "যদি আল্লাহ্‌র কিতাবে সে সমস্যার সমাধান না মেলে তখন তুমি কি করবে?" উত্তরে মায়ায বলেছিলেন, "তখন আমি আল্লাহ্‌র রসূলের হাদীস নুসরণ করবো (এবং সমস্যার সমাধান করবো)। রসুলাল্লাহ্ তখন বললেন 'যদি তুমি হাদীস বা সুন্নাহ্‌তেও কিছু না পাও (তখন কি

করবে)?" হযরত মায়াষ উত্তর দিলেন, "সেক্ষেত্রে আমি নিজ বিচার-বুদ্ধি দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চেষ্টা করবো"। রসুলাল্লাহ্ তখন বললেন, আল্লাহ্‌রই প্রশংসা যিনি তাঁর ইচ্ছায় তাঁর প্রেরিত দূতের দূতকে পরিচালিত করেন।"[১]

উল্লিখিত হাদীসে পরিষ্কারভাবে বুদ্ধি-বিবেচনা দ্বারা ইজতেহাদ করার ইঙ্গিত রয়েছে। সাহাবিগণ এবং তাঁদের অনুসারিগণ সকলেই রসুলুল্লাহ্‌র এ বাণীর মর্ম অনুধাবন করে ইজতেহাদের আশ্রয় নিয়েছিলেন।

ইজতেহাদ ইসলামের জীবনীশক্তি বলে ধর্মবিশারদগণ বার বার উল্লেখ করে গেছেন। ইজতেহাদ বন্ধ হয়ে গেলে ইসলামের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে যেতে বাধ্য। তাই হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহলভী (রাঃ) প্রত্যেক যুগেই ইজতেহাদকে ফরয বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন, "পূর্ববর্তী মুজতাহিদগণ কর্তৃক যা লিপিবদ্ধ হয়েছে তা সকল যুগের জন্য যথেষ্ট নয়।"[৩] "যারা এ ধারণা পোষণ করে যে একালে মুজতাহীদ পাওয়া যায় না বা যেতে পারে না তারা নিতান্ত ভুল করে থাকেন।"[২] তাই আধুনিক পরিবর্তনশীল দুনিয়ায় ইসলামের গতিশীলতা চালু রাখতে হলে বা ইসলামকে গতিশীল ও সজীব রাখতে হলে ইজতেহাদের আশ্রয় নিতেই হবে। বর্তমানে দুনিয়ার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনধারার পরিপ্রেক্ষিতে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোতে এবং প্রাথমিক যুগের মুজতাহীদদের প্রদর্শিত নীতির ভিত্তিতে ইজতেহাদ করতে হবে।[৫] কুরআন হাদীস এবং ফেকাহ শাস্ত্রে দক্ষ এবং চারিত্রিক গুণে গুণান্বিত এমন সব ধর্মপ্রাণ মুসলমানকে ইজতেহাদ করার ভার গ্রহণ করতে হবে। ভারত, বাংলাদেশ, মিসর, আরব এবং অন্যান্য দেশের বিশিষ্ট আলেমগণ বর্তমানে ইজতেহাদের প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে অনুভব করছে।

## ইসলাম একটি বিশদ জীবনসংহিতা

ইজতেহাদের দ্বারা কুরআন এবং সুন্নাহ্‌র বিধানাদির সম্প্রসারণের নীতি মানবীয় সমস্যাসঙ্কুল জীবনের এক অতি অভিনব এবং বাস্তব পন্থাই বটে। ইজতেহাদ দ্বারা মুসলমানগণ যে-কোন সমস্যা সমাধান করতে সমর্থ হতে পারে এবং এদিক দিয়ে ইসলামী আইনের প্রসারতা

অতি গুরুত্বপূর্ণ। কেবল আইনের ক্ষেত্রেই নয়, জীবনের সব ক্ষেত্রে ইসলাম এক পরিপূর্ণ কর্মসূচী দিয়েছে। এ কারণে ইসলামকে একটি বিশদ এবং পূর্ণাঙ্গ জীবনসংহিতা বলা যেতে পারে। এতে মানুষের ধর্ম কর্ম, পারিবারিক, সামাজিক, দেওয়ানী, ফৌজদরী, শাসনতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ের ব্যবস্থাবলী রয়েছে। ধর্মানুষ্ঠান হতে আরম্ভ করে জীবনযাত্রার দৈনিন্দিন কাজ-কারবার পর্যন্ত যাবতীয় বিষয় এতে সন্নিবেশিত রয়েছে। মানবাত্মার মুক্তি হতে আরম্ভ করে শারীরিক সুস্থতা; দল বা সম্প্রদায়ের দাবি-দাওয়া হতে আরম্ভ করে ব্যক্তিবিশেষের দাবি-দাওয়া, সৎ স্বভাব ও সদাচারের বিবৃতি হতে আরম্ভ করে পাপাচারের বিবৃতি পর্যন্ত এবং ঐহিক কর্মফল হতে পারত্রিক কর্মফলের বিবৃতি পর্যন্ত সব কিছু এতে স্থান পেয়েছে।

টীকা প্রসঙ্গ ও গ্রন্থালোচনা

১। এ ধরনের যুক্তি ডঃ ইকবাল তাঁর Reconstruction of Religious Thoughts in Islam গ্রন্থে প্রদর্শন করেছেন।

২। আবু দাউদ।

৩। হযরত শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ দেহলভী—মুছাওয়া।

৪। ঐ —ইকদুলজীদ।

৫। বর্তমানে ইজতেহাদে মত্‌লক বা স্বাধীনভাবে সর্ববিষয়ে ইজতেহাদ করার দরকার নেই। কেবলমাত্র নতুন নতুন সমস্যার সমাধানকল্পে ইজতেহাদ করাই যথেষ্ট।

সপ্তম অধ্যায়

# ঈমান বা বিশ্বাস

ঈমান আরবী শব্দ। এর অর্থ বিশ্বাস বা আস্থা স্থাপন করা। কুরআনের বিভিন্ন স্থানে ঈমান সম্পর্ক বর্ণনা রয়েছে। কোন্ কোন্ কাজ ঈমানের সহায়ক বা পরিচায়ক এবং কোন্ কোন্ কাজ ঈমানের পরিপন্থী কুরআনে তার বিবরণ রয়েছে।

ইসলামী শরীয়তে ঈমানের বিশেষ অর্থ হলো হযরত মুহম্মদ (সঃ) লোকের হিতার্থে আল্লাহ্‌র নিকট হতে যা প্রাপ্ত হয়ে প্রচার করেছেন, তাতে বিশ্বাস বা আস্থা স্থাপন করা; তাঁকে এ বিষয়ে সত্যবাদী বলে সর্বান্তঃকরণে মেনে নেয়া; খোদাতে বিশ্বাস, তাঁর সৃষ্ট ফেরেশতাগণে বিশ্বাস, অন্যান্য নবী-রসুলগণে বিশ্বাস, আল্লাহ্‌র কিতাব-সমূহে বিশ্বাস এবং পরকালে বিশ্বাস। ঈমান অন্তরের বিশ্বাস বা আস্থারই নাম এবং এর বহিঃপ্রকাশই হলো কর্ম।

## ইসলাম ও ঈমান

স্বেচ্ছায় এবং বিনা দ্বিধায় খোদার আনুগত্য স্বীকার করার নামই ইসলাম; কলেমা, নামায, রোজা, হজ্ব ও যাকাত এর প্রধান অঙ্গ। এ ছাড়া মানব-জীবনের এমন কোনও দিক নেই যা ইসলামের আওতা-ভুক্ত নয়।

ইসলাম এবং ঈমান যে একই বলে ধরে নেয়া হয় তার প্রকৃত অর্থ এই যে মুমিন বা বিশ্বাসী মাত্রই মুসলিম এবং প্রকৃত মুসলিম মাত্রই মুমিন। ইসলাম ঈমানেরই ফল। অর্থাৎ যে ব্যক্তি প্রকৃতভাবে আল্লাহ্ এবং রসুলের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে সে কখনও মুখে খোদার একত্ববাদ ঘোষণা না করে এবং নামায, রোজা, হজ্ব, যাকাত এবং রসুলের আদেশ-নিষেধ পালন না করে পারে না।

### কুফর এবং ঈমানের মধ্যে পার্থক্য

যে ব্যক্তি অন্তরে আল্লাহ্ এবং তাঁর প্রেরিত নবীতে বিশ্বাস স্থাপন করে না এবং প্রকাশ্যভাবে মুখেও তা ঘোষণা করে না তাকে ইসলামী দৃষ্টিতে কাফের বলা হয়। যে অন্তরে বিশ্বাস করে নি কিন্তু বাহ্যিক-ভাবে সামাজিক বা রাজনৈতিক সুবিধাদি ভোগ করার জন্য মুখে বিশ্বাসের কথা ঘোষণা করেছে তাকে কাফের এবং মুনাফেক, (যার মুখে এক কথা অন্তরে ভিন্ন ভাব) উভয়ই বলা যেতে পারে। মুনাফেক কাফের অপেক্ষাও নিকৃষ্টতর; কারণ সে সবসাধারণকে ধোঁকার মধ্যে ফেলে রাখে বা তাদের চোখে ধুলো দিয়ে নিজ কার্যসিদ্ধি করে চলে। আর যে অন্তরে বিশ্বাস করেছে; মুখেও তা ঘোষণা করেছে কিন্তু তদনুযায়ী কাজ করে না, তাকে 'ফাসেক' মুমিন বলা হয়ে থাকে। যেমন কেউ আল্লাহ্-রসূলে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেছে এবং মুখেও ত কলেমা ইত্যাদির মাধ্যমে ঘোষণা করেছে, কিন্তু নামায, রোজা ইত্যাদি বাহ্যিক করণীয় কাজ করে না, তাকে 'ফাসেক' বলা হয়। সুতরাং যে অন্তরে বিশ্বাস করেছে, মুখেও ঘোষণা করেছে এবং কাজও করেছে ইসলামের চোখে সে-ই কামেল বা পূর্ণ মুমিন।

### ঈমান বা বিশ্বাসের মূল নীতি

**আল্লাহ্‌র ওপর ঈমান :** আল্লাহ্‌র ওপর ঈমান বলতে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব এবং একত্বে বিশ্বাসকেই বুঝাইয়া থাকে। আল্লাহ্‌র ওপর এভাবে বিশ্বাস করতে হবে যে, তিনি অতি মহান, অনাদি, অনন্ত, চিরকাল আছেন এবং চিরকাল থাকবেন। তাঁর অস্তিত্বে আদি-অন্তের অবকাশ নেই। যখন কিছুই ছিল না তখন তিনি ছিলেন, এবং যখন কিছুই থাকবে না তখনও তিনি বিরাজ করবেন বা থাকবেন। তিনি সর্বত্র এবং সর্বদা বর্তমান। তাঁর অস্তিত্বের ন্যায় তাঁর গুণবলীও অনাদি এবং অনন্ত। তিনি স্থান ও কালের সীমানায় সীমাবদ্ধ নন।

আল্লাহ্‌ই নিখিল বিশ্বের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ও মালিক। তিনি অনন্ত আকাশ, গ্রহ-নক্ষত্র, চন্দ্র-সূর্য, সাগর-মহাসাগর, উপসাগর,

জীবজন্তু, পাহাড়-পর্বত, তরুলতা, গাছপালা ইত্যাদি দৃশ্য ও অদৃশ্য সবই তিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি সকলের একচ্ছত্র অধিপতি এবং সকলের পালনকর্তা। তিনি তাঁর সৃষ্টির যে বস্তুকে বা যাকে যে ভাবে সৃষ্টি করেছেন তাই তার উপযোগী এবং তার জন্য মঙ্গলজনক মনে করতে হবে।

আল্লাহ্ই বিশ্বজগতের একমাত্র পরিচালক। তাঁর হুকুমেই চন্দ্র-সূর্য উদিত হয় এবং অস্তমিত হয়। তাঁরই আদেশে জীব-জন্তু, তরু-লতা জন্মলাভ করে এবং মৃত্যুবরণ করে থাকে। তিনি ইচ্ছাময় এবং তিনিই বিশ্বের প্রতিপালক মহাপ্রভু। তাঁর কোনও হুকুম বা ন্যায় বা অন্যায় অবিচারপ্রসূত নয়। তিনি যা করেন সবই সৃষ্টির মঙ্গলের জন্য মনে করতে হবে।

আল্লাহ্ এক এবং অদ্বিতীয় এবং একমাত্র তিনিই উপাসনার যোগ্য। তিনি ব্যতীত অন্য কোনও উপাস্য নেই বা উপাসনার যোগ্য কেউ নেই। তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। তিনি অন্য কেউ হতে জন্মলাভ করেন নি এবং কাউকে জন্মদান করেন নি। কেউ তাঁর সমকক্ষ নেই, তাঁর কোন অংশীদারও নেই; তিনি একক, সদা বিদ্যমান। তিনি সর্বশক্তিমান ও পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু ও দাতা। তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন এবং করেন। জগতের সব কিছুই তাঁর ইচ্ছায় হচ্ছে। তিনি সব কিছুই জানেন, দেখেন এবং শোনেন। ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর পরমাণু গুপ্ত হতে গুপ্ততর কল্পনা এবং ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর শব্দ তাঁর দেখা-শোনা এবং জানার বাইরে নয়। তিনি সৎগুণাবলীতে গুণান্বিত এবং যাবতীয় অসৎগুণাবলী হতে পবিত্র। তিনি যাকে যা দান করেন, অনুগ্রহ করেই করেন। কিছুই তাঁর পক্ষে কর্তব্য নয়। তিনি পাপের শাস্তি ও পুণ্যের পুরস্কার দেন, কিন্তু কোনটিতেই তিনি বাধ্য নন। তিনি নিরাকাঙ্ক্ষী এবং সকল অভাবের অতীত।

এসব গুণের আধার সর্বশক্তিমান খোদাতালার ওপর বিশ্বাস রাখার ফলে বিশ্বাসী ব্যক্তির জীবন খোদার হুকুমেরই অধীন হয়ে যায়; সে কখনও তাঁর হুকুমের ব্যতিক্রম কিছুই করতে পারে না। পক্ষান্তরে

সে সর্বশক্তিমান খোদাতালাকে নিজের প্রভু ও অতি দয়ালু পালনকর্তা মনে করে হৃদয়ে এক অপূর্ব শক্তি অনুভব করতে থাকে এবং খোদার প্রেমে ও আত্মবিশ্বাসে তার মন ভরে ওঠে।

## শের্‌ক

খোদায় একত্বে বিশ্বাসের বিপরীত হলো শের্‌ক। খোদা ছাড়া অন্য কারও উপাসনা করা জঘন্য রকমের শের্‌ক, যেমন - পাথর, বৃক্ষ, কোন জীব মূর্তি, কবর, চন্দ্র, সূর্য বা প্রাকৃতিক যে-কোন জিনিসকে খোদা মনে করে উপাসনা করা; কাউকে খোদার অংশীদার মনে করে উপাসনা করা বা একে অন্যের উপাসনা করাও শের্‌ক। আবার নিজের অতি অধম মনোবাঞ্ছার তাবেদার হওয়াকেও কুরআনে শের্‌ক বলা হয়েছে। (২৫ : ৪৩)। এর অর্থ বিশ্বাসী ব্যক্তি একমাত্র খোদারই তাবেদার হবেন। তিনি নিজ কুপ্রবৃত্তির তাঁবেদার হতে পারেন না। আবার কাউকে মান-ইজ্জতের মালিক বা জীবিকা দানকারী বলে মনে করাকেও শের্‌ক বলা যেতে পারে। কেউ কারও ক্ষতি করতে পারে বা মৃত্যু ঘটাতে পারে বলে বিশ্বাস করাও শের্‌ক। কোন লোককে অধিক মমতার অধিকারী বলে বিশ্বাস করে তার তাঁবেদার হয়ে পড়াকেও শের্‌ক বলা যেতে পারে। শের্‌ক মহাপাপ। কুরআনের মতে খোদাতালা শের্‌ক ক্ষমা করবেন না; এছাড়া অন্য সব পাপের জন্য তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে থাকেন (৪ : ৪৮)।

ত্রিত্ববাদ বা খোদার মধ্যে পিতাপুত্র ও পরমাত্মার মিলন (trinity) কেও কুরআনে শের্‌ক বলে উল্লেখ করা হয়েছে (৪ : ৭১)। "খোদার পুত্র থাকার মতবাদকে" কুরআনে পরিষ্কারভাবে একটি অবাঞ্ছিত কল্পনা এবং শের্‌ক বলে ঘোষণা করা হয়েছে; কারণ, তিনি কাউকে জন্ম দেন না; এটা তাঁর পক্ষে শোভনীয়ও নয় যে তিনি পুত্র-সন্তান গ্রহণ করবেন। কারণ, তিনি যখন কোন কাজ করা মনস্থ করেন তখন তিনি সে মর্মে হুকুম দেয়া মাত্র তা সম্পাদিত হয়ে যায় (১৯ : ৯২)।

শেরক মানুষকে দুর্বল করে দেয় এবং তাকে এক কাল্পনিক দাসত্বের অধীন করে রাখে। ফলে তার মনোবল ভেঙ্গে যায় এবং তার নৈতিক মান শোচনীয় পর্যায়ে নেমে আসে। তাকে সব সময় সন্দিগ্ধ হয়ে বিচরণ করতে হয় এবং মনোবল নিয়ে সে কিছু করতে পারে না।

## খোদার অস্তিত্বে এবং একত্বে বিশ্বাসের তাৎপর্য

তাওহীদ বা খোদার একত্বে এবং অস্তিত্বে বিশ্বাসীদের মনোবল অটুট ও সুদৃঢ়। তাঁরা সর্বকালে এবং সর্বক্ষণ এক খোদা ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করতে জানেন না বা কারও নিকট মাথা নত করতে রাজী হন না। কারণ তাঁরা জানেন এক আল্লাহ্‌ই সর্বক্ষমতার অধিকারী। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ কারও উপকার বা অপকার করতে পারে না। তাই হযরত মুজাদ্দেদে আল্‌ফে সানীর ন্যায় বিশ্বাসী মুসলিম মাথা নত করে প্রবল প্রতাপান্বিত মুগল সম্রাট জাহাঙ্গীরকে কুর্নিশ করতে রাজী হননি, তার চেয়ে কারাবরণ করাকেই তিনি উত্তম মনে করেছিলেন। খোদাতে বিশ্বাসিগণ যে কেবল কোন মানুষ এবং সর্বপ্রকার সচেতন ও অচেতন পদার্থের গোলামি হতে মুক্ত তা নয়, তাঁরা অতি শক্তিশালী প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের প্রভাব হতেও মুক্ত।[১] একই খোদার আনুগত্য স্বীকার ব্যতীত অন্য কারও আনুগত্য স্বীকার করা যায় না বলে তাঁরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন। তাঁরা মানুষের মধ্যে সাম্য ও ঐক্যের ভাব লক্ষ্য করতে পারেন; কেননা মানুষ একই খোদার সৃষ্ট এবং তাই পরস্পর সমান এবং একই বাঁধনে আবদ্ধ। উৎপীড়ন বা পরাধীনতার গ্লানি তাঁরা বরদাস্ত করতে পারেন না। তাঁরা আত্মসম্মান ও আত্মমর্যাদা বোধে সচেতন।

প্রকৃত বিশ্বাসী খোদার সৃষ্ট জাতি একই শৃংখলা এবং নিয়মের অধীন বলে উপলব্ধি করতে পারেন; সজীব-নির্জীব সমস্ত জাগতিক পদার্থ যে একই নিয়মের অধীন হয়ে চলছে তা তাঁরা লক্ষ্য করেন। তাঁরা লক্ষ্য করেন, চন্দ্র, সূর্য, তারকামণ্ডলী প্রভৃতি একইভাবে উদিত ও অস্তমিত হচ্ছে; খোদার একই নিয়মতন্ত্রের অধীনে সবাই চলছে। তাঁরা বুঝতে

পারেন এবং মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন যে, একই সর্বশক্তিমানের ইচ্ছার অধীন সৃষ্ট জাতি একই নিয়ম রক্ষা করে চলেছে। একে কুরআনে ফেতরাত বলা হয়েছে। খোদার অন্য কোনও অংশীদার থাকলে এ নিয়মের নিশ্চয় ব্যতিক্রম দেখা দিতো (২১ঃ২২); ক্ষমতা বণ্টনের ফলে বা ক্ষমতা দ্বন্দ্বের ফলে জাগতিক নিয়মের ধারায় নিশ্চয় ব্যতিক্রম সংঘটিত হতো (২৩ঃ৯১)। কুরআনে এ বিষয়ে বিশদভাবে যুক্তি দেখান হয়েছে। বিশ্বাসিগণ তাই মনে করেন যে, খোদা তাঁর অস্তিত্ব, ব্যক্তিত্বে (যাত) গুণাবলীতে (সেফাৎ) এবং কার্যাবলীতে (আফ-আল) এক এবং অদ্বিতীয়।

বিশ্বাসী মানুষ যেমন আত্মসম্মানবোধে উদ্বুদ্ধ এবং অসীম সাহসের অধিকারী হতে সক্ষম হন, তেমনি তিনি নিরহঙ্কার ও বিনয়ীও বটে। ধন-দৌলত, মান সম্মান, ক্ষমতা সবই খোদার দান ও অনুগ্রহ বলে তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করে থাকেন। তাই তিনি অবনত মস্তকে সর্বশক্তিমান বিশ্বপালকের নিকট করুণা ভিক্ষা করে থাকেন এবং অন্তরের অন্তঃস্থল হতে তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

## মানুষ খোদার সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব এবং তাঁরই প্রতিনিধি

কুরআনে মানুষকে পৃথিবীতে খোদার খলীফা বা প্রতিনিধি বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তাই সমস্ত পৃথিবী তাঁর কর্তৃত্বাধীন করে দেয়া হয়েছে। সে জলে স্থলে-আকাশে সর্বত্র তাঁর ক্ষমতা এবং জ্ঞান-গরিমা প্রদর্শন করতে সক্ষম হচ্ছে। সৃষ্টিকর্তার নির্দেশে সমস্ত জাগতিক পদার্থ তাঁরই কাজে নিয়োজিত রয়েছে। সে প্রকৃতির পূজারী বলে কি করে প্রকৃতির ওপর নিজ প্রাধান্য বিস্তার করতে পারতো? সে চন্দ্র-সূর্যকে খোদার সৃষ্ট আজ্ঞাবহ মনে না করে যদি বিভিন্ন শক্তি বলে পূজা করে তবে সে কি করে খোদার খলীফা বা প্রতিনিধি হিসেবে তাদের ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করতে সমর্থ হবে? অপরপক্ষে খোদার খলীফা হিসেবে তাঁরই প্রদত্ত-শক্তি এবং জ্ঞান বলে সে তাদের ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করতে সাহসী হবে এবং ভাবাবেগে ও কৃতজ্ঞতাভরে খোদার মহিমার কথা ঘোষণা করতে থাকবে।

বিশ্বাসী মানুষ খোদার খলীফা হিসেবে তাঁরই গুণে গুণান্বিত হতে চেষ্টা করেন। তিনি যেমন খোদার পরম করুণা এবং দয়া প্রত্যাশা করেন তেমনি অপরের প্রতিও ক্ষমা এবং দয়া প্রদর্শন করা নিজ কর্তব্য বলে মনে করে থাকেন। খোদা রাব্বুল আলামীন বা বিশ্বের প্রতিপালক। তিনি তাঁর ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে খোদাতালারই সন্তুষ্টি বিধানের জন্য জনকল্যাণ সাধনে আত্মনিয়োগ করে আত্মিক শান্তি ও আনন্দ লাভ করে থাকেন।

তওহীদে বিশ্বাসী মানুষ পবিত্র বা বিশুদ্ধ জীবন-যাপন করতে সর্বদা সচেষ্ট থাকেন। খোদাতে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস আছে বলে তিনি যে কোন অবস্থায় হতোদ্যম বা নিরুৎসাহ হতে জানেন না। কারণ, তাঁর বিশ্বাস খোদাতালা যখন যা করেন তা তাঁর বান্দার ভালোর জন্যই করে থাকেন। আল্লাহ্ অতি দাতা এবং দয়ালু এবং তাই তিনি যে কোন অবস্থায় আশায় বুক বেঁধে ধৈর্য ধারণ করে থাকেন এবং অবিচলিতভাবে খোদার বিধিনিষেধ পালনে রত থাকেন।

তওহীদের বাণী হযরত মুহম্মদ (সঃ)-এর শিক্ষার মূল কথা। তা ইসলামের চাবিকাঠি। অপরাপর বিশ্বাস, বিধি-নিষেধ এ ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। একে বাদ দিলে ইসলামের আর কিছুই থাকে না।

## টীকা প্রসঙ্গ এবং গ্রন্থালোচনা

১. মওলনা মুহম্মদ আলী—The Riligion of Islam.

অষ্টম অধ্যায়

# স্বর্গীয় ফেরেশতায় বিশ্বাস ও কিতাবে বিশ্বাস

## ফেরেস্তায় বিশ্বাস

বিশ্বাসী মুসলিম হতে হলে মানুষকে খোদার সৃষ্ট ফেরেশতাদের অস্তিত্বেও বিশ্বাস করতে হবে। তাঁদের প্রতি বিশ্বাস বলতে বুঝায় যে, তাঁরাও আল্লাহ্‌র সৃষ্টি। তাঁরা নূরের তৈরী। তাঁদের সংখ্যা আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ জানে না। তাঁদের আহার-নিদ্রা নেই। তাঁদের কাজ সর্বক্ষণ আল্লাহ্‌র এবাদত বা উপাসনা করা। তাঁরা আল্লাহ্‌র আদেশ পালনে সর্বদা তৈরী থাকেন। তাঁরা পুরুষও নন, স্ত্রীলোকও নন। তাঁরা খোদার ইচ্ছায় যে কোনও রূপ গ্রহণ করতে পারেন। তাঁরা কখনও আল্লাহ্‌র হুকুম অমান্য করেন না, করতে পারেন না। আল্লাহ্‌র হুকুম পালন করাই তাঁদের একমাত্র কর্তব্য। কুরআনে বলা হয়েছে, "আল্লাহ্ যা তাঁদের হুকুম করবেন তাঁরা তা অমান্য করেন না; তাঁরা যে যেভাবে আদিষ্ট সে সেভাবে কাজ করে থাকেন (৬৬ : ৬)। তাঁদের কোন কিছুর ভেদাভেদ করার ক্ষমতা নেই। মানুষের ন্যায় তাঁদের কোনও কাজ করার স্বতন্ত্র ইচ্ছা বলতে কিছু নেই।

ফেরেশতাদের চারজন সর্বশ্রেষ্ঠ; যথা—হযরত জিব্রাঈল (আঃ), হযরত মীকাইল (আঃ), হযরত আজরাঈল (আঃ) এবং হযরত ইসরাফিল (আঃ)। হযরত জিব্রাইলের কাজ ছিল নবীদের কাছে আল্লাহ্‌র বাণী পৌঁছিয়ে দেয়া। হযরত মীকাঈলের কর্তব্য জীবের জীবিকার ব্যবস্থা করে দেওয়া; হযরত আজরাঈলের কাজ হলো জীবের জান কবয বা বের করে মৃত্যু ঘটান এবং হযরত ইসরাফিলের কাজ শিঙ্গা মুখে নিয়ে আল্লাহ্‌র হুকুমের অপেক্ষায় থাকা এবং খোদার আদেশ পাওয়া মাত্রই শিঙ্গায় ফুৎকার দান এবং এর সঙ্গে সঙ্গে কেয়ামত আরম্ভ হয়ে যাবে। এ চারজন

ফেরেশতা ব্যতীত মানুষের ভালমন্দ কাজ লিপিবদ্ধ করার জন্য প্রত্যেক লোকের সঙ্গে কেরামান-কাতেবিন নামে দুই ফেরেশতাও রয়েছেন (৮২ : ১০ – ১২)।

ফেরেশতাগণকে আমরা চর্মচোখে দেখতে পাই না সত্য ; তবে দেখতে পাই না বলে তাঁদের অস্তিত্বে অস্বীকার করতে আমরা পারি না, কারণ কোনও জিনিসকে না জানা বা না দেখা তার না থাকার প্রমাণ নয়। পানি ও বাতাসের মধ্যে বহু জীব ও জীবাণু রয়েছে যা আমরা সাধারণভাবে দেখতে পাইনে, যন্ত্রের সাহায্যে দেখতে পাই। যখন যন্ত্রের আবিষ্কার হয়নি তখন কি তারা ছিল না ? অনুরূপভাবে গ্যাসের সন্ধান লাভের পূর্বে গ্যাস ছিল না বলতে পারিনে। কুরআন-হাদীসে ফেরেশতা-দের সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে। কুরআন-হাদীসে বিশ্বাস স্থাপনের পর তাঁদের প্রতি অবিশ্বাসের কোন কারণ থাকতে পারে না।

আল্লাহ্ যখন মানুষ সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করেছিলেন, তখন ফেরেশতাদের কাছে তাঁর সে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন (২ : ৩০ ; ১৫ : ২৮ ; ৩৮ : ৭১)। এ থেকে বোঝা যায় যে মানুষের সৃষ্টির পূর্বে ফেরেশতাগণ বিদ্যমান ছিল এবং কিছু প্রাকৃতিক জগৎ ও মানব সৃষ্টির সাথে জড়িত ছিল তার সাথে তাঁদের কোন না কোন প্রকার সম্পর্ক ছিল। ফেরেশ-তাদের মাধ্যমেই যে খোদায়ী ইচ্ছা প্রকাশ লাভ করে থাকে তার ইঙ্গিতও কুরআনের আয়াতসমূহে রয়েছে। তাঁদের যদি খোদার ইচ্ছার বাহকরূপে পরিগণিত করা না হয় তবে তাঁদের কাছে খোদার মানুষ সৃষ্টি করার ইচ্ছা প্রকাশ করার কোন অর্থই হয় না।[১]

মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করাই ফেরেশতার কাজ। ফেরেশতার মাধ্যমেই স্বর্গীয় বাণী লাভ করা সম্ভব হয় এবং স্বর্গীয় বাণী দ্বারা মানুষ আধ্যাত্মিক জীবন কি তা বুঝতে পারে এবং সে তার অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ সাধন করে আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে অগ্রসর হতে সমর্থ হয়।[১]

ফেরেশতাগণ বিশ্বাসীদের বিপদে সান্ত্বনা দিয়ে থাকেন (৪১ : ৩০) ; তাঁরা বিশ্বাসীদের সাহায্যার্থে তাঁদের শত্রুর বিরুদ্ধে প্রেরিত হন

(৩ ঃ ১২৩, ১২৪ ; ৮ ঃ ১২)। তাঁরা মহানবী (৩৩ ঃ ৫৬) এবং বিশ্ববাসী-দের জন্য (৩ ঃ ৪৩) খোদার কাছে প্রার্থনা করেন এবং বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী সকলের জন্য খোদার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে থাকেন (৪২ ঃ ৫); এবং শেষ বিচারের দিন তাঁরা মানুষের পরিত্রাণের জন্য খোদার কাছে সুপারিশ করবেন (৫৩ ঃ ২৬)।

প্রত্যেক ভাল এবং মহান কাজ ফেরেশতাদের অনুপ্রেরণারই ফল। সুতরাং ফেরেশতাতে বিশ্বাস বলতে প্রত্যেক ভাল কাজ করার ইঙ্গিত বা প্রেরণাকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করাকেই বুঝিয়ে থাকে।[১]

## খোদাপ্রদত্ত কিতাবে বিশ্বাস

বিভিন্ন যুগে মানুষের পার্থিব এবং পারলৌকিক উন্নতি বিধানের জন্য আল্লাহ্ তাঁর মনোনীত নবীদের মাধ্যমে যে সব কিতাব বা গ্রন্থ পাঠিয়েছিলেন সেসবের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করাও ঈমানের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এসব গ্রন্থের মধ্যে যেটি যে-যুগে যে নবীর ওপর মানুষের পথপ্রদর্শক হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছিল সেটি সে যুগের জন্য সম্পূর্ণ উপযোগী ছিল এবং তার বর্ণনাও সম্পূর্ণ সত্য বলে বিশ্বাস করতে হবে। অতঃপর যুগের কিতাবপ্রাপ্ত লোকগণ কর্তৃক তা বিকৃত করা হলে বা কোন দুর্ঘটনায় তা বিনষ্ট হয়ে গেলে অথবা সভ্যতার ক্রমবিকাশের ফলে তার যুগ শেষ হয়ে গেলে আল্লাহ্ নতুন কিতাব (সংস্করণ) পাঠিয়ে দেন। এরূপ কিতাবের সংখ্যা অনেক, তবে সেগুলোর মধ্যে চারটি হলো প্রধান; যথা—হযরত মূসা (আঃ)-এর তৌরাত, হযরত দাউদ (আঃ)-এর জবুর, হযরত ঈসা (আঃ)-এর ইঞ্জিল এবং হযরত মুহম্মদ (সঃ)-এর কুরআন। কিতাবসমূহের মধ্যে কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ গ্রন্থ। এতে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যসমূহ এবং ভবিষ্যৎ মানব-জীবনের সমস্যাবলী সমাধানের অত্যাবশ্যক সূত্রসমূহ সন্নিবেশিত রয়েছে।

কুরআনের পূর্বেকার কিতাবসমূহের মধ্যে কোনোটি কোনো বিশেষ গোত্রের জন্য, কোনোটি কোনো বিশেষ স্থানের জন্য এবং কোনোটি কোনো বিশেষ যুগের জন্য প্রেরিত হয়েছিল; কিন্তু কুরআন অবতীর্ণ

হয়েছে সমস্ত বিশ্বের মানুষের জন্য এবং চিরকালের জন্য। কুরআন হযরত মুহম্মদ (সঃ)-এর ওপর যেভাবে এবং যে পরিমাণে অবতীর্ণ হয়েছিল তা হুবহু আজও বিদ্যমান রয়েছে। এর বিন্দুমাত্র রদবদল হয় নি।

ধর্মের মূলনীতিগুলো একই ছিল এবং রয়েছে। কুরআনে এ নীতি-গুলো বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং এতে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ইতিহাসের নজির পেশ করা হয়েছে। এ নীতিসমূহ বিশ্লেষণ এবং পূর্ব-বর্তী ইতিহাসের নজির পেশ করতে গিয়ে কুরআন পূর্ববর্তী কিতাব সমূহে সময়ের সাথে যে-সব দোষত্রুটি ঢুকে পড়েছিল তা বিদূরিত করেছে।

বাইবেল এবং অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে নবীদের সম্পর্কে এমন সব অশোভন এবং কল্পিত কথার বর্ণনা রয়েছে যা কোন খোদাপ্রদত্ত কিতাবে থাকতে পারে না এবং যা প্রত্যেক শিক্ষিত ধর্মভীরু লোকের কাছে বিসদৃশ্য মনে হবে। উদাহরণ স্বরূপ কোন নবীকে খোদার পুত্র বলে আখ্যায়িত করা, কোন নবীকে মিথ্যাবাদী বা যৌন অপরাধে অপরাধী বলে উল্লেখ করা ইত্যাদি বিষয় ইঞ্জিল বা অপরাপর মূলধর্মগ্রন্থে ছিল না; অথচ পরবর্তীকালে এ সব বিষয় ধর্মগ্রন্থসমূহে স্থান লাভ করেছে। কুরআন নবীদের সম্পর্কে এমন সব অবাঞ্ছিত বিবৃতি নাকচ করে দিয়েছে, যারা এ সব ধর্মপুস্তক স্বার্থপ্রণোদিত হয়ে বিকৃত করেছে তাদের সম্পর্কে কুরআন বলেছে, "তারা অভিশপ্ত যারা নিজের হাতে কিতাব লিখে বলে যে এ খোদারই কিতাব (২ঃ৭৫)।

কুরআনে মানুষের জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের প্রত্যেকটি খুঁটি-নাটি কাজের বিধান ও আদর্শ যে রকম বিশদভাবে পাওয়া যায় অন্য ধর্মগ্রন্থে তেমন পাওয়া যায় না।

উল্লিখিত কারণে কুরআন অনুসরণের পর অন্যান্য ধর্মগ্রন্থসমূহে মানুষের জন্য অনুসরণীয় ও পালনীয় তেমন কিছু বাকী থাকে না। তাই বিনা দ্বিধায় বলা যেতে পারে যে, কুরআন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ এবং তা

অন্যান্য ধর্মগ্রন্থসমূহকে মনসূখ করে দিয়েছে বা সেগুলোর যুগের সমাপ্তি ঘোষণা করেছে।

## টীকাপ্রসঙ্গ ও গ্রন্থ-পরিচিতি

১. মওলানা মুহম্মদ আলী—The Religion of Islam.
২. ঐ ঐ
৩. ঐ ঐ

নবম অধ্যায়

# নবী-রসূলে বিশ্বাস

## নবী ও রসূলের অর্থ

রসূল শব্দের অর্থ প্রেরিত। যিনি মানুষকে আল্লাহ্‌র মনোনীত পথপ্রদর্শক করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে ওহী বা ঐশীবাণী ও কিতাব সহ মানুষের নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন তাঁকেই রসূল বলা হয়ে থাকে। নবীর অর্থ সংবাদদাতা। যিনি আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে মানুষকে ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র মনোনীত পথ প্রদর্শন করেছিলেন তাঁকে নবী বলা হয়। সুতরাং প্রত্যেক রসূলই নবী। কারণ, তাঁর ওহী ও কিতাব উভয়ই ছিল। সকল নবী রসূলের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করাও ঈমানের অংশবিশেষ।

আল্লাহ যুগে যুগে মানুষের হেদায়েতের জন্য অর্থাৎ জীবন-যাপনের ব্যাপারে আল্লাহর মনোনীত পথপ্রদর্শন করার জন্য এবং তা হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়ার জন্য বহু নবী এবং রসূল পাঠিয়েছিলেন। তাঁরা সকলেই মানুষকে আল্লাহ্‌র একত্ববাদের মহান শিক্ষা, পবিত্র জীবন-যাপন পদ্ধতি ও আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের সন্ধান দিয়েছিলেন। তাঁরা সকলেই ছিলেন নিষ্পাপ এবং সকলেই আদর্শ জীবন-যাপন করেছিলেন। হযরত আদম (আঃ) সর্বপ্রথম নবী এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী এবং রসূল ছিলেন হযরত মুহম্মদ (সঃ)। তাঁরা কখনও আল্লাহ্‌র আদেশ লংঘন করেন নি, তাঁরা তাঁদের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য অর্থাৎ ভুল বা বিস্মৃতির জন্য তাঁর করুণা ভিক্ষা করেছেন বা তাঁর আশ্রয় চেয়েছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের ন্যায় তাঁরা জেনে-শুনে সরাসরি খোদার নির্দেশিত কোনও হুকুম অমান্য করেন নি। যেমন হযরত আদম (আঃ) তাঁর ভুল বা বিস্মৃতির জন্য খোদার করুণাপ্রার্থী হয়েছিলেন; কিন্তু মহান

আল্লাহ্‌র আদেশ লংঘন করে নিষিদ্ধ বৃক্ষের নিকট যাওয়ার কোন পরিকল্পনা তাঁর ছিল না (২০ : ১১৫)। এ জন্যই খোদাতা'লা তাঁর প্রার্থনা বা ক্ষমা প্রার্থনা কবুল করেছিলেন। নবী রসুলদের জীবনের আর একটি লক্ষনীয় বিষয় এই যে, তাঁরা নবুয়ত লাভের পূর্বেও শেরক্‌ মুক্ত ছিলেন ; আল্লাহ্‌র সঙ্গে কাউকে শরীক করে তার উপাসনা করেন নি বা কোন নীতি বিগর্হিত কাজ করেন নি। যেমন দেখা যায় হযরত মুহম্মদ (সঃ) বাল্যাবস্থায়ও ব্যভিচারী আরবদের পুতুল পূজা এবং মদ্যপান, জুয়া ইত্যাদি ব্যভিচার হতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন (৫৩ : ২)।

## হযরত মুহম্মদ (সঃ)-এর অলৌকিক শক্তি

নবীদের জীবনে অলৌকিক ঘটনাও ঘটতো। তাঁরা ওহী ব্যতীত অলৌকিক ক্ষমতারও অধিকারী ছিলেন। তাঁদের সে ক্ষমতাও খোদা-প্রদত্ত। তা তাঁরা বিশেষ সময়ে এবং কাজে দেখিয়েছিলেন। যেমন হযরত মূসা (আঃ) যাদুকরদের যাদু নষ্ট করার জন্য তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করে তাদের যাদুর প্রভাব বিলুপ্ত করে দিয়েছিলেন। এ-রকম অলৌকিক ঘটনার কথা ধর্মবিশ্বাসী সুফী-দরবেশদের জীবন-কাহিনীতেও রয়েছে। তাঁদের 'অলৌকিক শক্তি' সাধারণতঃ কেরামত বলেই পরিচিত। তবে অলৌকিক ক্ষমতা দেখান নবীদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। মানুষকে সুপথ প্রদর্শন করে তাদের কল্যাণ সাধন করাই তাঁদের মুখ্য ব্রত ছিল। তাই তাঁদের মূল অবলম্বন ছিল খোদাপ্রদত্ত ওহী। ওহী ছিল নবীদের জীবনের সবচেয়ে বড় অলৌকিক শক্তি এবং অবলম্বন।

হযরত মুহম্মদ (সঃ)-এর জীবনের সবচেয়ে বড় অলৌকিক শক্তি হলো কুরআন। কেননা তার সঙ্গে যে কোনও দিক দিয়ে তুলনা হতে পারে এমন কোন গ্রন্থ কেউ আজ পর্যন্ত রচনা করতে পারে নি। তাই কুরআন হযরত মুহম্মদ (সঃ)-এর জীবনে এক শ্রেষ্ঠ অলৌকিক শক্তি এবং সম্পদই বটে। তা ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, জাতি এবং দেশের পরিবর্তন সাধন করতে সক্ষম হয়েছিল। তা মানুষের নৈতিক, আত্মিক ও মানসিক উন্নতি সাধন করেছিল ; তার প্রভাব অন্য যে-কোনও নবীর অলৌকিক প্রভাবের চেয়ে শত সহস্র গুণ বেশী ফলপ্রসূ হয়েছিল।[১]

যুগে যুগে মানুষের কাছে নবী এসেছিলেন; আসার প্রয়োজন ছিল এমন কোন জাতি ছিল না যার কাছে পথপ্রদর্শনকারী (নবী বা রসুল) প্রেরিত হয় নি (১০ : ৪৭)। নবী-রসুলদের সঠিক সংখ্যা জানা যায় না। কুরআনে মাত্র পঁচিশ জনের নামের উল্লেখ আছে। এক হাদীসে নবী ও রসুলদের সংখ্যা এক লক্ষ চব্বিশ হাজার বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে তিন শত পনের জন ছিলেন রসুল।[২]

ওহী বা ঐশীবাণী মহাপুরুষদের মাধ্যমেই মানুষের কাছে প্রকাশ লাভ করেছিল। ঐশী বাণীতে বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানের এক প্রধান অঙ্গ। সুতরাং যে-সব মহাপুরুষদের মাধ্যমে ঐশীবাণী লোক-সমাজে প্রকাশিত হয়েছিল তাঁদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাও ঈমানের অঙ্গ বিশেষ। তাই কুরআনে খোদার প্রেরিত কিতাবে বিশ্বাস স্থাপনের সঙ্গে সকল নবী-রসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের কথাও বলা হয়েছে (২ : ১৭৭, ২৮৫)।

নবী-রসুলগণ কেবল স্বর্গীয় বাণীর বাহক ছিলেন না, তাঁরা সে বাণী কিভাবে বাস্তবক্ষেত্রে রূপায়িত হতে পারে তার নজিরও লোকসমক্ষে পেশ করেছিলেন। তাই তাঁদের আদর্শ তাদের অনুসারীদের হৃদয়ে জীবন্ত বিশ্বাসের অনুপ্রেরণা জাগিয়ে তোলে এবং তাদের জীবনে সত্যিকারের পরিবর্তন সাধন করে থাকে।

মানুষের মধ্য হতেই নবী-রসুল মনোনীত হয়েছিলেন; কেননা মানুষ নবীর মাধ্যমেই মানুষের আধ্যাত্মিক ও ঐহিক উন্নতি বিধান সম্ভবপর। মহাপুরুষদের নিকট ঐশীবাণী পৌঁছানো হলো ফেরেশতার কাজ। ফেরে-শতা নূরের তৈরী এবং মানুষ হতে সব দিক দিয়েই স্বতন্ত্র। তাই ফেরেশতা মানুষের পথপ্রদর্শক হতে পারে না। এ যুক্তিও কুরআনে দেয়া রয়েছে, "যদি পৃথিবীর অধিবাসিগণ ফেরেশতা হতো এবং মানুষের ন্যায় পৃথিবীতে চলাফেরা করতো, তবে আমি আসমান হতে তাদের নিকট ফেরেশতা পাঠাতাম (১৭ : ২৫)"। "আমি তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য হতেই একজন রসুল (মনোনীত করে) পাঠিয়েছি, তিনি তোমাদের আমার বাণী পড়ে শোনাবেন, তোমাদের বিশুদ্ধ করবেন এবং কিতাব ও জ্ঞান শিক্ষা দেবেন (২ : ২৫১)" ইত্যাদি।

## নবীদের চারিত্রিক গুণাবলী

নবী-রসুলদের চারিত্রিক গুণাবলী এবং তাদের নিকট প্রেরিত ওহী ও কিতাবই তাদের নবুয়তের প্রকৃত নিদর্শন। তাদের অতি উন্নতমানের চরিত্র এবং কিতাব জগদ্বাসীর নিকট ছিল এক অতুলনীয় বিষয়। মহানবীর চরিত্র এবং কুরআনের অলৌকিকত্বও তার নবুয়তের সাক্ষ্য বহন করেছে। কুরআনে বলা হয়েছে, "সমস্ত মানুষ এবং জিন একত্রিত হয়ে এবং একে অপরের সাহায্য নিয়ে চেষ্টা করলেও কুরআনের ন্যায় একটি (গ্রন্থ) তৈরী করতে সক্ষম হবে না (১৭ : ৮৮)"। "এবং আমি আমার বান্দার (মুহম্মদ সঃ) নিকট যা পাঠিয়েছি সে সম্পর্কে তোমাদের যদি কোন প্রকার সন্দেহ থাকে তবে এর ন্যায় এক নমুনা রচনা করো তা (২ : ২৩); তবে তোমরা কখনও তা করতে সক্ষম হবে না (২ : ২৪)"।

মহানবীর জীবনী লেখক প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার বস্‌ওয়ার্থ স্মিথ্‌, কুরআন সম্পর্কে বলেছেন, "এ একটি অলৌকিক বস্তু বলে মুহম্মদ (সঃ) দাবি করতেন—এ একটি অলৌকিক বস্তুই বটে" তিনি আরও বলেছেন, "যদি ঐশী ক্ষমতাবলে রাজ্যশাসন করেছেন বলে কেউ দাবি করতে পারেন তবে তিনি হলেন একমাত্র হযরত মুহম্মদ (সঃ)"।[৩]

## খতমে নবুয়ত বা নবুয়তের সমাপ্তি

হযরত মুহম্মদ (সঃ) ছিলেন সর্বশেষ নবী। তাঁর পরে আর কোন নবী আসবেন না বা আসার প্রয়োজন হবে না। মহানবীর মাধ্যমে যে মানব-জীবন দর্শন রচিত হয়েছে এবং জীবন-যাপন পদ্ধতি রচিত হয়েছে তা যুগ-যুগান্তর ব্যাপী মানুষের উপযোগী থাকবে। তাই ইসলামী সমাজ ব্যবস্থাকে গতিশীল ব্যবস্থা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তাই মহানবীর মাধ্যমে নবুয়তের সমাপ্তি কুরআনে বিঘোষিত হয়েছে। "তিনি (মুহম্মদ সঃ) আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষ এবং সর্বশেষ নবী (৩৩ : ৪০)"।

মহানবীর পূর্বে যে সব নবী এসেছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই কোন এক যুগের এবং জাতির বা সম্প্রদায়ের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। কিন্তু হযরত মুহম্মদ (সঃ) বিশ্বের সকল যুগের এবং জাতির উদ্দেশ্যেই প্রেরিত

হয়েছিলেন; তাই তিনি ছিলেন একজন বিশ্বনবী। "তিনি মহিমান্বিত (আল্লাহ্) যিনি তাঁর বান্দা (মুহম্মদ সঃ)-র ওপর ফোরকান (কুরআন) অবতীর্ণ করেছেন যাতে তিনি সকল জাতির নিকট সতর্কবাণী উচ্চারণ করতে পারেন (২৫ : ১)"। "আমি আপনাকে সমস্ত (বিশ্বের) মানুষের নিকট সুখবর বহনকারী এবং সাবধানকারী হিসেবে পাঠিয়েছি (৩৪ : ২৮)"। "আমি আপনাকে বিশ্ববাসীদের নিকট রহমত বা করুণার প্রতীক হিসেবে পাঠিয়েছি (২১ : ১০৭)"।

বিশ্বের সমস্ত মানবগোষ্ঠীকে একই জাতিত্ববোধে উদ্বুদ্ধ করে তোলাই ইসলামের মূল উদ্দেশ্য (২ : ১৩)। নবুয়তের পরিসমাপ্তি ব্যতীত এক জাতিত্ববোধ জাগানো সম্ভব নয়; কারণ বিশ্বনবীর পর যদি একের পর এক নবী আসতে থাকতেন তা হলে প্রত্যেকেই কেবল নিজ নিজ দলীয় অনুসারীদের আনুগত্য কামনা করতেন এবং সেজন্য ইসলামের এক জাতিত্বের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যেতো।

মানুষের ঐহিক এবং পারলৌকিক জীবন সম্পর্কে পূর্ণ কর্মসূচী কুরআনে চৌদ্দশত বছর পূর্বে যেমন ছিল আজও তেমনি বিদ্যমান রয়ে গেছে। কুরআনের একটি অক্ষরও আজ পর্যন্ত পরিবর্তিত হয় নি। মহানবীর কথা, উপদেশ এবং কার্যাবলীর বর্ণনা আজ পর্যন্ত নিখুঁতভাবে রয়ে গেছে। তাঁর জন্মমুহূর্ত হতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত জীবনের খুঁটিনাটি সমস্ত বিষয়েরই বিশদ এবং বিশ্বস্ত বিবরণ রক্ষিত আছে। অপরপক্ষে পূর্ববর্তী নবীদের কিতাবসমূহ বিকৃত অবস্থায়ই বিদ্যমান রয়েছে। তৌরাত, জবুর, ইঞ্জিল ইত্যাদি কিতাবের কোনটিই আদিরূপে রক্ষিত নেই। এ-সব কিতাবের অনুসারিগণ তাদের কাছে তাদের আদি ধর্মগ্রন্থের নকল নেই বলে নিজেরাই স্বীকার করে থাকে। এমন কি, কোন্ নবী কখন এসেছিলেন এবং জীবনের কোন্ পর্যায়ে কি কাজ করেছিলেন, মানুষকেই বা কি রকম জীবন সংহিতা দিয়ে গিয়েছিলেন বর্তমানে তার তেমন কোন হদীস পাওয়া যায় না। খোদার একত্ববাদ প্রচার করা সব যুগের নবীদের প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য ছিল। অথচ তাঁদের অন্তর্ধানের পর তাঁদের কিতাব-সমূহ বিকৃত হয়ে এমন সব অযৌক্তিক শের্কের কথা (যেমন ঈসা (আঃ)

খোদার পুত্র, হযরত উজায়ের (আঃ) খোদার পুত্র ইত্যাদি) তাতে স্থান লাভ করেছে যে বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়।

পবিত্র কুরআন নিখুঁতভাবেই রক্ষিত থাকায় তা মানুষকে সর্বকালের ঐহিক এবং পারলৌকিক পথপ্রদর্শন করতে সক্ষম। এতে পূর্ববর্তী ধর্মসমূহের মৌলিক উপাদান রক্ষিত হয়েছে। পূর্ববর্তী ধর্মসমূহে পরকালে যেসব ভ্রান্তি ও কুসংস্কার পুঞ্জীভূত হয়েছিল তা সমূলে উৎপাটিত করে কুরআন মানব-জীবনের এক বিশদ কর্মতালিকা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। তাই তা সর্বজাতির এবং সর্বকালের জন্য পথপ্রদর্শক। তাই ইসলামী জীবন-ব্যবস্থায় যুগীয় এবং জাতীয় নবীদের কার্য তালিকার পরিসমাপ্তি হয়েছে এবং এর মাধ্যমে সকল নবীর মহান উদ্দেশ্য পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। কুরআনে বলা হয়েছে, "আজ আপনার জন্য আপনার ধর্ম (ইসলাম) কে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি এবং আপনার ওপর আমার আশীর্বাদ সম্পূর্ণ করেছি (৫ঃ৩)।" ধর্মের পরিণতি এবং আশীর্বাদের পরিপূর্ণতা বলতে একই কথা বোঝানো হয়ে থাকে। ধর্ম এবং নবুয়ত যখন মহানবীর মধ্যে পরিপূর্তি লাভ করেছে তখন আর কোন ধর্ম বা নবীর আবশ্যকতা থাকে না।

সমাজতন্ত্র আজ সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। ইসলাম চৌদ্দ শত বছর আগেই তার বুনিয়াদ রচনা করে দিয়েছিল। এ বিষয় দ্বিতীয় অধ্যায় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। ইসলামে গরীবের প্রতি যেমন দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে তেমনি তাদেরকে আত্মনির্ভরশীল ও আত্ম-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাদের নিজ কায়ক্লেশে জীবিকা অর্জন করার অর্থাৎ কাজ করে খাওয়ার অনুপ্রেরণা দেয়া হয়েছে। তেমনি ভাবে ইসলামী জীবন ধারায় গণতন্ত্র ও সামাজিক উদারনৈতিকতার কথাও রয়েছে এবং ইতিহাসে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণও রয়েছে। যে ইসলামের নীতি চৌদ্দ শত বছর আগে রচিত হয়েছিল এবং আধুনিক মূলনীতির সাথে যার মিল রয়েছে, তা কি ইসলামী জীবন-সংহিতার তথা ইসলামের পরিপূর্ণতার নিদর্শন নয়? তা কি নবুয়তের পরিসমাপ্তির প্রমাণ নয় কি?

মহানবীর অন্তর্ধানের পর আজ পর্যন্ত কোন সত্যিকার নবীর আবির্ভাব হয়নি। যাঁরা নবুয়তের দাবী করেছেন তাঁরা কেউ নবুয়তের পরীক্ষায় টিকে থাকতে পারেননি। এও মহানবীর খত্‌মে নবুয়তেরই সাক্ষ্য বহন করছে।

## টীকা প্রসঙ্গ ও গ্রন্থালোচনা

১। মওলানা মুহম্মদ আলী—The Religion of Islam.
২। তা'লীকুদ ছাবীহ্‌।
৩। বসওয়ার্থ স্মিথ—Life of Muhammad.

দশম অধ্যায়

# আখেরাত বা পরকালে বিশ্বাস

## পরকালের জীবন

পরকাল বলতে মৃত্যুর পর মানুষের যে জীবন বা জীবনকাল শুরু হয় তাকেই বোঝানো হয়। একে মানুষের পার্থিব জীবনের চেয়ে বহুগুণ উন্নত জীবন বলে কুরআনে বলা হয়েছে ;—"নিশ্চয়ই পরকালের জীবন (দুনিয়ার জীবন হতে) বহুগুণে উন্নত এবং শ্রেষ্ঠ (১৭ : ২১)"। খোদাতে বিশ্বাসের পরই পরকালে বিশ্বাসকে কুরআনে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। "যারা খোদাতে এবং পরকালে বিশ্বাস করে এবং ভাল কাজ করে তাঁরা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে পুরস্কার লাভ করবে (২ : ৬২)"।

পরকালের জীবন দু'পর্যায়ে বিভক্ত : আলমে বরযখ্ বা কবর এবং কেয়ামত। পরকালে বিশ্বাস বলতে মৃত্যুর পরের জীবন সম্পর্কে কুরআন-হাদীসে যা বর্ণিত আছে তা সত্য বলে বিশ্বাসকে বোঝায়। বিশ্বাস করতে হবে যে কবরে মানুষ শাস্তি বা অশান্তি ভোগ করবে ; অতঃপর কোন এক নির্দিষ্ট দিনে এ পৃথিবী এবং তার যাবতীয় পদার্থ ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। এ দিনকে কেয়ামত বা শেষ দিন বলা হয়ে থাকে। আল্লাহ্ ব্যতীত কেয়ামতের নির্দিষ্ট সময় কেহই বলতে পারে না। সৃষ্টির প্রথম হতে যত মানুষ জন্মলাভ করেছিল এবং মৃত্যুবরণ করেছিল তারা সকলেই আবার খোদার নির্দেশে কবর হতে উঠবে এবং তাঁর সম্মুখে হাজির হবে। একে পুনরুত্থান (Resurrection) বলা হয়ে থাকে। খোদা সেদিন বিচারাসনে সমাসীন হবেন। প্রত্যেক নর-নারীর ভাল-মন্দ কাজের বিবরণ তাঁর সামনে উপস্থিত করা হবে। এ বিবরণের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তাদের সমুচিত বিচার করবেন। এ জন্যই এ দিনকে বিচারের দিন এবং হিসাবের দিনও বলা হয়ে থাকে। যাদের ভাল কাজের

পরিমাণ বেশী বলে প্রমাণিত হবে তার পুরস্কারস্বরূপ তাদের বেহেশতের অনন্ত সুখের অধিকারী করা হবে। পক্ষান্তরে যাদের মন্দ কাজের পরিমাণ বেশী বলে সাব্যস্ত হবে তাদের জাহান্নামের অগ্নিকুণ্ডে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

### বরযখ বা কবর জীবন

বরযখ অর্থ ব্যবধান। লোকচক্ষুর অন্তরালে পার্থিব জগৎ ও কেয়ামতের মধ্যবর্তী যে জগৎ রয়েছে তাকে আলমে বরযখ বলা হয়। অপর অর্থে একে কবরও বলা হয়ে থাকে। প্রত্যেক মানুষের মৃত্যুর পর তার কবরের জীবন আরম্ভ হয়। কুরআনে বলা হয়েছে, "এবং তাদের পশ্চাতে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত একটি মধ্যবর্তী জীবন আছে (২৩ঃ ১০০)"। মানুষ পার্থিব জীবনের পাপ-পুণ্যের ফলাফল বরযখ জীবনেও ভোগ করে থাকে। কুরআন বলেন, "অচীরেই আমি তাদের (অবিশ্বাসী বা কাফের) দু'বার শাস্তি প্রদান করবো। তৎপর তাদেরকে ভীষণ শাস্তির দিকে ধাবিত করা হবে (৯ঃ ১০১)"। এ স্থলে জাহান্নামের শাস্তিকেই ভীষণ শাস্তি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এর আগের দু'বারের শাস্তি হলো ইহজগতের শাস্তি এবং আলম-ই-বরযখের শাস্তি।

বরযখকে মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশের দ্বিতীয় পর্যায় বলে মনে করা যেতে পারে। তার প্রথম পর্যায়ের সূচনা হয় এ পৃথিবীতে। মানুষের দৈহিক বিকাশ লাভের যেমন তিনটি পর্যায় পরিলক্ষিত হয়, তেমনই আধ্যাত্মিক বিকাশ ক্ষেত্রেও তার তিনটি পর্যায় লক্ষ্য করা যায়। মানুষ প্রথমতঃ মাটির পর্যায়ে থাকে, অতঃপর সে মায়ের গর্ভে ভ্রূণ-পর্যায়ে এবং সর্বশেষে সে নবজাত শিশুর পর্যায়ে আসে। তেমনি তার আধ্যাত্মিক বিকাশের প্রথম পর্যায় এ পৃথিবীতে শুরু হয়ে থাকে; তখন তার এ জীবন সম্পর্কে তেমন জ্ঞানলাভ হয় না, দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয় কবর বা বরযখে; তখন তার একটু জ্ঞান জন্মে এবং তৃতীয় পর্যায়ে বা পুনরুত্থানের সময় তার পূর্ণ জ্ঞানলাভ হয়ে থাকে। তাই দৈহিক বিকাশের ন্যায় বরযখ মানুষের আত্মিক বিকাশের এক অতি অত্যাবশ্যক

পর্যায়েই বটে। যারা এ পৃথিবীতে খারাপ কাজ করেছে, এ পর্যায়ে তারা আত্মিক অনুশোচনায় ভুগতে থাকে এবং পৃথিবীতে ফিরে যেতে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে থাকে[১] (২৩ : ১০০)।

কবর কেবল দেহের অবস্থান; এ বাসস্থানের সাথে রূহের সম্পর্ক থাকলেও রূহ্ এখানে আবদ্ধ থাকে না। যেমন আয়নার মধ্যে মানুষ আপন আকৃতি দেখতে পায় বলে আয়নার সঙ্গে তার সম্পর্ক হয়। কিন্তু তাই বলে আয়নাতে তার শরীর আবদ্ধ থাকে না। কবরে শরীরের সঙ্গে রূহ্ বা আত্মার সম্পর্কও তাই।[২]

মৃত্যু হলে মানুষের মূলসত্তা ধ্বংস হয়ে যায় না; কেবল হাত, পা, চোখ, কান প্রভৃতি স্থূল দৈহিক ইন্দ্রিয়গুলির ধ্বংস হয় মাত্র। ইন্দ্রিয়ের শক্তি কেড়ে নিলে তার সঙ্গে ঘর-সংসার, স্ত্রী-পুত্র, জমি-জমা, গরু-ঘোড়া, আত্মীয়-স্বজন এমনকি আসমান-যমীন এবং যা কিছু ইন্দ্রিয়-গুলির সাথে জড়িত রয়েছে সব কিছুই কেড়ে নেয়া হয়। মানুষ যদি পৃথিবীর এ সমস্ত বস্তুর মোহে মনকে মোহিত করে রাখে, তবে মৃত্যুর পর এসবের বিরহজনিত দুঃখ-কষ্ট স্বভাবতঃই সে অনুভব করতে থাকবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি পার্থিব কোন পদার্থের মায়ায় মুগ্ধ না হয়ে জগতের যাবতীয় সম্পর্ক ও বন্ধন ছিন্ন করে স্বাধীন হতে পারে এবং মৃত্যুর অপেক্ষায় সর্বদা প্রস্তুত থাকতে পারে সে ব্যক্তি মৃত্যুর পরে অবশ্যই সুখ-শান্তি ভোগ করবে। তাই খোদাভীরু লোককে কবর আযাব ভোগ করতে হবে না, কেবল সংসারের মায়ায় মুগ্ধ এবং দুনিয়ার প্রতি অনুরক্ত ব্যক্তিই তা ভোগ করবে।[৩]

### কেয়ামত

পরকালের দ্বিতীয় পর্যায় হলো কেয়ামত। এ জীবন কেয়ামত হতে অনন্তকাল পর্যন্ত চলতে থাকবে। এর ইতি নেই। কুরআনে বলা হয়েছে, "তোমরা যা করেছিলে আজকের দিনে তোমাদের তার ফল প্রদান করা হবে (৪৫ : ২৮)"। যাঁরা ইহজীবনে নানাপ্রকার প্রতিকূল অবস্থায় বিপদের ওপর বিপদ সহ্য করে ধৈর্য হারান নি, বরং ধৈর্যের

সাথে আল্লাহ্‌র ভয়ে অসৎকাজ হতে বিরত রয়েছেন এবং তাঁর আদেশ মেনে চলেছেন তাঁরাই জান্নাত বা বেহেশ্তে যাবেন। "যে স্বীয় প্রভুর সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়ার ভয়ে ভীত থাকে এবং কু-প্রবৃত্তি হতে নিজেকে রক্ষা ক'রে চলে, নিশ্চয় জান্নাতেই তার ঠিকানা (৭৯ঃ ৩৯–৪০)"। কিন্তু যারা ইহজীবনকে সব কিছু মনে করে পরজীবনকে কোন গুরুত্ব দেয়নি এবং পার্থিব সুখ-সম্পদের মোহে অন্যায় এবং অসৎকাজে লিপ্ত রয়েছে তারা দুঃখময় জাহান্নামে বাস করবে। কুরআন বলেন, "যে ব্যক্তি অবাধ্যাচরণ করে এবং ইহজীবনকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে তাকে আঁকড়ে থাকে নিশ্চয় জাহান্নাম তার বাসস্থান (৭৯ঃ ৩৭–৩৮)"।

পুনরুত্থানের কথা

কিয়ামতের দিন মানুষের পুনরুত্থান হবে বলে বিশ্বাস করতে হবে। এ ঈমানেরই অংশ। তবে তখন মানুষ যে আবার সশরীরে কবর থেকে উঠবে এর অর্থ এই নয় যে, তার আত্মার ধ্বংসপ্রাপ্তির পর তাকে আবার অস্তিত্ব প্রদান করে দেহের সাথে তাকে সংযুক্ত করে দেয়া হবে; বরং এর অর্থ এই যে, আত্মাকে সেদিন আবার একটি শরীর প্রদান করা হবে, অর্থাৎ দেহকে আগের ন্যায় আর একবার গঠন করা হবে এবং আত্মার আত্মাবহ করে দেয়া হবে। মৃত্যুর পর আত্মাকে আর একবার শরীর প্রদান করা খোদার পক্ষে খুবই সহজ ব্যাপার। কেননা প্রথম সৃষ্টির সময় আত্মা এবং দেহ উভয়কেই সৃষ্টি করতে হয়েছিল। মৃত্যুর পর আত্মা অমর এবং স্থায়ী থেকে যায়। মৃত্যুর পর দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিও স্থানে স্থানে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে থাকে; এদের একত্রিত করা নূতন সৃষ্টি অপেক্ষা সহজ বলে নিশ্চয়ই আমরা মনে করতে পারি। আল্লাহ্‌র পক্ষে তো সহজ বা কঠিন বলে কিছু নেই। দ্বিতীয়বার জীবিত করার সময় প্রথমবারের দেহের সংযোগ করার কোন প্রয়োজন নেই। কেননা দেহটি একটি বাহন বই কিছু নয়, বাহন ধ্বংস হয়ে গেলে আরোহীর মূল অবস্থার পরিবর্তন ঘটে না। শৈশব কাল হতে বৃদ্ধাবস্থা পর্যন্ত মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিবর্তন হচ্ছে; কিন্তু তার আত্মা সৃষ্টিকালে যেমন

ছিল বরাবর তেমনই থেকে যায়। দেহের সঙ্গে আত্মার সংযোগ সাধন কালে আদি সৃষ্টিকালীন দেহ পাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই।[৪]

## পরকালে বিশ্বাসের তাৎপর্য

পরকালে বিশ্বাস মহানবীর শিক্ষার প্রধান অঙ্গ ছিল। অন্যান্য নবীও তাঁর ন্যায় একইভাবে তাঁদের অনুসারীদের পরকালে বিশ্বাস করতে আহ্বান করেছিলেন। এ বিশ্বাস মুসলমান হওয়ার একটি প্রধান শর্তও বটে। পরকালে অবিশ্বাসীকে প্রত্যেক নবী পরিষ্কারভাবে কাফের বলে ঘোষণা করতেন। পরকালে বিশ্বাস না থাকলে অন্য সব বিশ্বাস অর্থহীন হয়ে পড়ে। এ অবিশ্বাস পবিত্র জীবনাদর্শের মূলে কুঠারাঘাত করে এবং মানুষকে অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত করে। পরকালে বিশ্বাসী লোক মনে করে যে, তার ভাল-মন্দ এবং ন্যায়-অন্যায় কাজের জন্য একদিন তাকে আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহি করতে হবে; তাই সে সবরকম খারাপ কাজ হতে বিরত থাকে এবং পবিত্রভাবে জীবনযাপন করতে আপ্রাণ চেষ্টা করে থাকে।

পক্ষান্তরে যার পরকালে বিশ্বাস নেই সে বে-সামাল ও দায়িত্বহীন হয়। অন্যায় কাজ করতে সে ভয় পায় না; বিবেক কয়জনকেই বা বাধা দেয়? আর এরূপ বিবেক নিয়ে কয়জনই বা জন্মলাভ করে থাকে? অবিশ্বাসিগণ খোদায়ী আইন-কানুনে বিশ্বাসী হতে পারে না; তার নিকট খোদার অনুগ্রহ স্বীকার করা, বা না করা, একই কথা। পার্থিব সুখ-বিলাস ত্যাগ করে পরহিতে আত্মোৎসর্গ করার অনুপ্রেরণা হতে এমন লোক বঞ্চিত থাকে। সে নিজ স্বার্থ ব্যতীত কোন কাজ করতে রাজী থাকে না। সে যদি কখনও কোন খারাপ কাজ হতে বিরত থাকে তবে সে তার নিজ স্বার্থের খাতিরেই তা করে থাকে। সে কখনও চিন্তা করে না যে তার আয়ু শৈবালের নীরের ন্যায় এবং যে কোনও মুহূর্তে তাকে দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করে যেতে হতে পারে। সে ক্ষণস্থায়ী রাজ্য-মোহে দণ্ডধারী যম সেজে লোকের উপকার না করে তাদের সর্বনাশ সাধন করতে দ্বিধাবোধ করে না। সে পার্থিব বস্তুকে নিজ উপভোগের

বস্তু মনে করে নিজের দিকে আকর্ষণ করতে প্রয়াস পায়। সর্বশক্তিমানের চিন্তা তার হৃদয়ে স্থান পাওয়ার অবকাশ থাকে না।

পরকালে বিশ্বাসী পার্থিব লাভ-ক্ষতি সাময়িক ব্যাপার বলে মনে করে। তাই পরকালের অনন্ত শান্তিলাভের আশায় সে যে-কোন প্রকার ব্যক্তিগত ক্ষতি স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকে এবং সর্বপ্রকার খারাপ ও লোকের অমঙ্গলজনক কাজ হতে বিরত থাকে। টাকা-পয়সা এবং সম্পত্তি অর্জন, জনসাধারণের প্রশংসালাভ ইত্যাদি অবিশ্বাসীর জীবনের প্রধান লক্ষ্য। যেসব কাজ তার এসব উদ্দেশ্য লাভের পরিপন্থী সে তা খারাপ বলে বিবেচনা করে থাকে। গরীবকে অর্থদান করলে বা যাকাত আদায় করলে তার অর্থ কমে যাবে বলে সে মনে করে। অন্যের অর্থ বা সম্পত্তি সুযোগ বুঝে আত্মসাৎ করতে এবং সত্য বলতে গেলে নিজ স্বার্থের ক্ষতি হতে পারে মনে করে সে মিথ্যা বলতে দ্বিধা-বোধ করে না। বিশ্বাসী লোকের ভাল-মন্দের ধারণা খোদার সন্তুষ্টি লাভের ওপরই নির্ভর করে, তাঁর নিজের ক্ষতি হলেও তিনি ধৈর্য ধারণ করে সৎপথে চলতে থাকেন। তিনি অনন্ত কালের অনন্ত সুখের প্রত্যাশী বলে খোদা-রসুলের নির্দেশ মেনে চলতে আপ্রাণ চেষ্টা করে থাকেন এবং যে কোনও অবস্থাতেও বিশ্বাসহীন হন না।

### বাস্তব দৃষ্টিতে পরকাল

পৃথিবী যে-কোন এক সময় ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে তা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সত্য প্রতিপন্ন হয়ে থাকে। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে, কোন এক সময় সূর্য ঠাণ্ডা হয়ে শক্তিহীন হয়ে পড়বে; তারকামণ্ডলীর পারস্পরিক সংঘর্ষ বাধবে এবং মহাবিশ্বে প্রলয় সাধিত হবে। অধিকন্তু বিবর্তন যদি বিশ্বের সর্বক্ষেত্রে সংগঠিত হতে পারে, তবে মহাবিশ্বের ব্যাপারেও কেন বিবর্তন-নীতি প্রযোজ্য হবে না। বরং বিবর্তনের ফলে উন্নত ধরনের নূতন কিছুর আবির্ভাব হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। মানুষ যে পরকালে আবার জীবিত হয়ে উঠবে তা অবিশ্বাস করার কারণ থাকতে পারে না। কারণ, আল্লাহ্ মানুষকে যখন একবার মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন তিনি পুনরায় তার

ধ্বংসপ্রাপ্ত শরীরের ধূলিকণা হতে অবশ্যই তাকে আবার সৃষ্টি করতে সক্ষম হবেন।

টেপরেকর্ডার, গ্রামোফোন ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির আবিষ্কারের ফলে প্রমাণিত হয়েছে যে, মানুষের পার্থিব ভাল-মন্দ কথা, কাজ বা কাজের স্মৃতি সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয় না। বিশ্ব-রেকর্ডে তা থেকে যায়, তাই কেয়ামতের দিন প্রত্যেক মানুষ নিজ নিজ কাজের রেকর্ড স্বচক্ষে দেখতে পাবে বলে কুরআনে যে উল্লেখ রয়েছে তা বেশ বোধগম্য হচ্ছে।

আবার কেয়ামতের দিন খোদাতালা যে বিচারাসনে বসে পাপ-পুণ্যের বিচার করবেন তাও অতি যুক্তিসঙ্গত ঘোষণা। যুক্তিদ্বারা বিচার করলে এর সত্যতা উপলব্ধি করা যায়। পৃথিবীতে আমরা দেখতে পাই যে একজন লোক ভাল কাজ করে, কিন্তু ফলে কিছুই পায় না। আবার অন্য একজন লোক খারাপ কাজ করতে থাকে অথচ তজ্জন্য তাকে কোনপ্রকার কষ্টভোগ করতে হয় না। এমন বহু ঘটনা আমরা অহরহ লক্ষ্য করে থাকি। যুক্তি বা বিবেক বলে, যে ভাল কাজ করলো তার নিশ্চয়ই পুরস্কার পাওয়া উচিত ছিল এবং যে খারাপ কাজ করলো তার শাস্তি হওয়া উচিত। পরকালে যখন প্রবল নৈতিক বিধানের আধিপত্য পূর্ণমাত্রায় প্রতিষ্ঠিত হবে তখন এ ভাল-মন্দ কাজের নিশ্চয়ই বিচার হবে।

বেহেস্ত-দোজখ সম্পর্কেও বলা যায় যে আল্লাহ্ যখন চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদি নিয়ে বিশাল মহাবিশ্ব সৃষ্টি করতে পারেন, তখন তিনি কেন বেহেস্ত-দোযখ সৃষ্টি করতে সক্ষম হবেন না? আবার তিনি যেহেতু পাপ-পুণ্যের বিচার করবেন, পাপীকে তার শাস্তি ভোগ করার স্থান এবং নিষ্পাপীকে পুরস্কারস্বরূপ তার আনন্দ উপভোগ করার স্থানও দেবেন, তাই সাধারণ জ্ঞানে বেহেস্ত-দোযখ সৃষ্টির যৌক্তিকতা উপলব্ধি করা যায়।

## টীকাপ্রসঙ্গ ও গ্রন্থালোচনা

১। মওলানা মুহম্মদ আলী—The Religion of Islam.

২। মাওয়াহেবে আশরাফিয়া।

৩। কিমিয়ায়ে ছাদাত—ইমাম গাযযালী (রঃ)। মানুষ কখনও কখনও সুপ্ত অবস্থায় স্বপ্নযোগে কোন খারাপকৃত কার্যের জন্য শাস্তি ভোগ করছে বলে অনুভব করে থাকে এবং চীৎকার করেও ওঠে; অথচ অন্যকেহ তা অনুভব করতে পারে না। এমনিভাবে কবরের আযাব চলতে থাকে অথচ বাইর হতে অন্য কেউ তা অনুভব করতে সক্ষম হয় না।

৪। — ঐ —।

একাদশ অধ্যায়

# তক্‌দীর বা অদৃষ্টবাদ

## তকদীর সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ

মানুষের স্বাধীন চিন্তা এবং কাজ করার ক্ষমতা : তক্‌দীর আরবী শব্দ। এর মূল হলো কদর, কাদার। এর আভিধানিক অর্থ শক্তি ( Power ), কোন জিনিসের পরিমাণ (Measure)। কারও কারও মতে ( যেমন রাঘেব, মাওলানা মুহম্মদ আলী, পিকথল প্রমুখ ) সৃষ্টির মূলে যে নির্দিষ্ট পরিমাণের নীতি বা আইন-শৃংখলা পরিদৃষ্ট হয় তাকেই তক্‌দীর বলা হয়। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে, "নিশ্চয়ই আমি প্রত্যেক জিনিস কোন এক নির্দিষ্ট পরিমাণে ( কদর ) সৃষ্টি করেছি ( ৫৪ : ৩৯ )"। সূর্য তার নির্দিষ্ট পথে চলে, তা সর্বশক্তিমান এবং সর্বজ্ঞানীর (আল্লাহ্‌র) একটি নির্দিষ্ট আইন (তক্‌দীর); চন্দ্রের বেলায় আমি তার মঞ্জেল বা আবর্তন-পথসমূহ নির্দিষ্ট করে দিয়েছি (কাদ্‌দারণা তক্‌দীর হতে)। "এবং আল্লাহ্‌ রাত-দিনের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন (ইউকাদ্‌দের—তক্‌দীর হতে )"। "এবং আমি এক নির্দিষ্ট পরিমাণে মেঘ হতে বারি বর্ষণ করিয়ে থাকি (৭৩ : ২০)"—ইত্যাদি।

কুরআনের উল্লেখিত আয়াতসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে রাঘেব প্রমুখ উদারপন্থী মুসলিম পণ্ডিতগণ মানুষ এবং প্রাকৃতিক জগতের মধ্যে যে নির্দিষ্ট বিশ্বজনীন খোদায়ী আইন পরিলক্ষিত হয় তাকে তক্‌দীর বলে মনে করেন। তাঁদের মতে প্রত্যেক জিনিসের তক্‌দীর বলতে তার ক্রমিক বৃদ্ধি ও বিকাশের পরিমাণ বা আইনকে বুঝিয়ে থাকে। এ মত পোষণকারীদের মতে খোদা মানুষকে বিশেষ কার্যক্ষমতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এবং সে ক্ষমতা মানুষ তার নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থেকে

প্রয়োগ করতে পারে। যেমন তাকে কথা বলবার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, সে তা দিয়ে ভাল কথা বলে লোকের উপকার সাধন করতে পারে বা খারাপ কথা বলে অন্যের অপকার সাধনও করতে পারে। খোদার ইচ্ছা, সে তাঁর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে তাঁরই প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর সৃষ্ট জগতের উপকার সাধন করবে এবং বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য এগিয়ে আসবে। যা কিছু খারাপ বা মন্দ, অন্যায়, অবিচার, ব্যভিচার তাকে পদদলিত করে সে খোদার সার্বভৌম ক্ষমতা পৃথিবীতে ঘোষণা করবে ও প্রতিষ্ঠা করবে।[১]

মানুষকে খোদার খলীফা বা প্রতিনিধি মনোনীত করে খোদাতা'লা তার উপর এক বিরাট ও মহান দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছেন। তাই খোদার নির্দেশিত পথের সন্ধান বা ভালমন্দের জ্ঞান নবীর মারফত লাভ করে তাকে তার সীমিত শক্তি নিয়ে প্রতিকূল অবস্থার সাথে সংগ্রাম করে নির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হতে হবে। তার নির্দিষ্ট সীমাই হলো তার তক্‌দীর। কুরআন বলেন, সত্য আপনার প্রভূর নিকট হতে (পৌঁছান হয়েছে); সুতরাং যার ইচ্ছা সে তা গ্রহণ করুক এবং যার ইচ্ছা তা পরিহার করুক (১৮ঃ২৯)"। কোন কাজ করা বা না করা যখন মানুষের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে সে তখন তার কাজের জন্য দায়ী থাকবে এবং ফলাফল ভোগ করবে। তার চেষ্টার ফলাফল কি হবে বা সে কি করবে বা না করবে তা খোদার জ্ঞানে সীমিত রয়েছে বা তা খোদার জানা আছে; কারণ তিনি সবকিছু জানেন, তিনি সর্বজ্ঞ। তাঁর এই জানা মানুষের ভাল-মন্দ কাজের পথ বাছাই করে নেয়ার ব্যাপারে বাধা সৃষ্টি করে না।

### কাদেরিয়া মতবাদ

কাদেরিয়া সম্প্রদায়ের মতে মানুষের ইচ্ছা এবং কাজ করবার কদর বা ক্ষমতা আছে। মানুষ তার কাজের ওপর কদর বা ক্ষমতা রাখে; অর্থাৎ কাজ করার ক্ষমতা মানুষের এখতিয়ারভুক্ত রয়েছে; সে ইচ্ছা করলে ভাল কাজ করতে পারে এবং ইচ্ছা করলে খারাপ কাজও

করতে পারে। সে স্বাধীনভাবে ইচ্ছা মত কাজ করার ক্ষমতা রাখে। যদি তার স্বাধীনভাবে ভাল-মন্দ বেছে নেয়ার ক্ষমতা না থাকে তবে তাকে তার কাজের জন্য দায়ী করা যায় না। কিন্তু বস্তুতঃ সে তার কাজের জন্য দায়ী। মানুষ তার ভাল-মন্দ কাজের বিনিময় পরকালে পুরস্কার বা শাস্তি পাবে। কিন্তু স্বাধীনভাবে চিন্তা এবং কাজ করতে না পারলে তার কাজের দায়িত্ব কি করে তার ওপর আসে? মানুষকে তার কাজের জন্য দায়ী করতে হলে তাকে মুক্ত থাকতেই হবে; তাকে কাজ করার ক্ষমতা দিতেই হবে। মানুষের ভাগ্য পূর্বেই নির্ধারিত হয়ে থাকলে এবং তার কাজের এবং ইচ্ছার কোনও প্রকার স্বাধীনতা না থাকলে এবং সে সর্বশক্তিমানের কেবল আজ্ঞাবহ হয়ে থাকলে তার কাজের জন্য তাকে দায়ী করা যায় না।

## মুতাযিলা মতবাদ

মুতাযিলা সম্প্রদায়ও কাদেরিয়াদের মতো মানুষের ইচ্ছা এবং কাজের স্বাধীনতা আছে বলে মত পোষণ করে। তাদের মতে, মানুষ স্বাধীনভাবে নিজ বুদ্ধি ও বিবেচনা দ্বারা তার আপন কর্মপন্থা নির্ণয় করতে পারে। সে তার কার্যের প্রধান কারক। সে ভাল-মন্দ নিজ ইচ্ছায় বেছে নিতে পারে। সে ভাল কাজ করলে ভাল ফল পাবে এবং খারাপ কাজ করলে শাস্তি ভোগ করবে। পৃথিবীতে ভাল-মন্দ কাজের দরুন মানুষ পরকালে প্রতিফল পাবে। খোদা মানুষের কাজের স্রষ্টা নহেন। যদি মনে করা হয় যে, খোদা মানুষকে এমন কাজের জন্য শাস্তি দেবেন যার ওপর তার কোন এখতিয়ার বা নিয়ন্ত্রণ নেই, তবে খোদাকে অবিচারকারী এবং দয়াহীন মনে করতে হয়। সুতরাং, খোদার ন্যায়পরতা এবং দয়ার যৌক্তিকতা প্রদর্শন করতে হলে মানুষের ইচ্ছায় এবং কাজে স্বাধীনতা আছে বলে স্বীকার করতেই হবে। এই হলো মুতাযিলাদের 'আদল্' বা ন্যায় মতবাদের মূল কথা।

**জবরিয়া মতবাদ**

জবরিয়া মতবাদপন্থীদের মতে খোদাই মানুষের ভাল-মন্দ কাজের সৃষ্টিকর্তা এবং এ ব্যাপারে মানুষ সম্পূর্ণ শক্তিহীন। খোদা যেভাবে তাকে পরিচালিত করেন সে সেভাবে পরিচালিত হয়ে থাকে: তার নিজের কোন পথ বেছে নেবার ক্ষমতা নেই। সে আল্লাহ্‌র হাতে সম্পূর্ণ যন্ত্রের মতোই।

ইসলামী শরিয়ত মতে এবং বিশেষ করে সুন্নী জমাতের মতে উপরোল্লেখিত মতবাদগুলির একটিও সম্পূর্ণ সত্যনির্ভর নয়। মানুষের কাজের জন্য মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীনও নয় এবং সম্পূর্ণ মজবুর বা বাধ্যও নয়। মানুষের মধ্যে এমন একটি গুণ রয়েছে যা দ্বারা সে ভাল-মন্দের মধ্য হতে একটিকে বেছে নিতে পারে। একে 'কছব' বা এখতিয়ার বলা হয় থাকে। অবশ্য এ গুণ আল্লাহ্ তার মধ্যে সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তবে এর ব্যবহারে তিনি তাকে স্বাধীনতা দান করেছেন। এ 'এখতিয়ার' দ্বারা মানুষ ভাল-মন্দ কাজের মধ্য হতে যখন একটিকে বেছে নেয়, তখন আল্লাহ্‌ই তার সে কাজ সৃষ্টি করে দেন। সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ্‌তালাই। এ এখতিয়ার বা কছবের ফলেই মানুষের কাজের দায়িত্ব মানুষের ওপর বর্তায়। মানুষের ইচ্ছা এবং এখতিয়ার মানুষের কার্যের কারণ। এভাবে সৃষ্টির বহু জিনিস বহু জিনিসের কারণ। খোদাতা'লা তাঁর নিয়ম অনুসারে তার ঐ কার্যকারণের সম্পর্ক করে দিয়েছেন। কিন্তু তিনি ঐ কার্যকারণের সূত্র অনুসারে কার্যকারণে বাধ্য নন। ইচ্ছা করলে তিনি কার্যকারণের সূত্র ব্যতীতও কাজ করতে পারেন বা কারণ পাওয়া গেলেও কার্যের সৃষ্টি না করতে পারেন, সবই তাঁর ইচ্ছা।

**পরিশিষ্ট**

সাধারণ কথায় বলতে গেলে, তক্‌দীরে বিশ্বাসের অর্থ হলো, জগতে কার্য-কারণ যা কিছু ঘটেছে তার সবই অনাদি আল্লাহ্ জানেন; আল্লাহ্ তাঁর অসীম জ্ঞান দ্বারা তাঁর সৃষ্ট জগৎবাসী নিজ ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় যা করবে তা পূর্ব হতেই জানেন। সুতরাং তক্‌দীর বলতে খোদার

জ্ঞানের সীমাহীন প্রসারতাকেই বুঝিয়ে থাকে। অর্থাৎ খোদাতা'লা যা জানেন তাই আমরা করবো এ ভাবে না বুঝে আমরা যা নিজ ইচ্ছায় করবো তা তিনি পূর্ব হতেই জানেন এই আমাদের বুঝতে হবে। যদি তক্‌দীরের অর্থ এভাবে নেয়া হয় যে, তক্‌দীর বিশ্বাস করলে মানুষ কাবু হয়ে পড়বে এবং তার ইচ্ছা বা কাজ করবার এখতিয়ার বা স্বাধীনতা থাকবে না—তবে এমন কোন কথার আর অবকাশ থাকে না। এভাবে খোদা নিজ কাজ সম্পর্কেও ত' পূর্ব হতেই জ্ঞান রাখেন, তাই বলে কি তিনি সেভাবে কাজ করতে বাধ্য থাকেন এবং কাজ করার ব্যাপারে তাঁর স্বাধীনতা নেই কি? ডাক্তার রোগীর সমস্ত অবস্থা জানেন কখন কি অবস্থা হবে, কখন তার ভাল হবার সম্ভাবনা রয়েছে, কখন সে মারা যাবে ইত্যাদি; কিন্তু তার এ জানাটা রোগীর মৃত্যুর কারণ নয়। তার মৃত্যুর কারণ হলো তার রোগ। তেমনিভাবে খোদা সর্বজ্ঞ হিসেবে অনাদিকাল থেকে সবকিছু জানেন বা তাঁর জ্ঞানের মধ্যে সবকিছু সঠিকভাবে রয়েছে। তাই তাঁর এ জানা মানুষের কার্যের কারণ হতে পারে না। কারণ হচ্ছে মানুষের ইচ্ছা বা এরাদা। এজন্য তার ভাল-মন্দ কাজের জন্য সে নিজেই দায়ী থাকবে।

## টীকাপ্রসঙ্গ এবং গ্রন্থালোচনা

১। M. Pickthal—Cultural side of Islam (The charge of fatalism)। পিকথল সাহেব বলেন যে, তথাকথিত অদৃষ্টবাদ মুসলমানদের পতনের কারণ বলে কেউ কেউ মনে করে থাকেন; তা সত্য নয়। তাঁর মতে, অদৃষ্টবাদ বলতে তেমন কিছু নেই; যদি তা থাকতো তবে কিভাবে মুসলমানগণ এককালে সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, সামরিক ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে এত উন্নতি লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন? খোদার রাজ্যে সত্য ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে এবং অসত্যের মুকাবিলা

করতে গিয়ে তাঁরা রসুলের নির্দেশিত পথেরই অনুসারী হয়েছিলেন মাত্র। তার জন্য জান-মাল কখন বিনষ্ট হবে বা না হবে সেদিকে তাঁদের ভ্রূক্ষেপও ছিল না। তাঁরা একমাত্র খোদার দয়া এবং করুণার ওপর নিজদের সোপর্দ করে কাজে অগ্রসর হতেন। বিশেষ করে জেহাদে তাঁদের মানসিক অবস্থা এরূপই ছিল। আত্মরক্ষা, ন্যায়নীতি ও ধর্ম বা সত্যকে প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁরা নিজ প্রাণটুকু পর্যন্ত বিসর্জন দিতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না। ফলাফলের চিন্তা তাদের মনে স্থান পেতোনা এ-ই ছিল তাঁদের এক প্রকার 'অদৃষ্টবাদ'। খোদার নিকট আত্মসমর্পণ করে পরকালের পুরস্কার লাভের আশাই ছিল তাঁদের একমাত্র বিশ্বাস এবং প্রেরণা।

জেহাদ বলতে ধর্মীয় এবং রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা রক্ষার্থে কেবল বিধর্মীদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধকেই বোঝানো হয়ে থাকে। নিজের কুপ্রবৃত্তি ও স্বার্থপরতা, সামাজিক অত্যাচার, অবিচার, দুর্নীতি ইত্যাদির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাকেও এক প্রকার জেহাদ বলা চলে। তাই ধর্মযুদ্ধ বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে এ রকম জেহাদ করে যাওয়াই মুসলমানদের প্রকৃত কাজ ছিল। কারণ, পৃথিবীতে খোদার রাজত্ব এবং তাঁর আইন-শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করাই হবে মুসলমানদের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। ইসলামী সভ্যতায় ভাটা পড়েছে এ ধরনের জেহাদ হতে তাঁরা বিরত থেকেছেন বলে তথাকথিত অদৃষ্টবাদের ফলে নয় (পিকথল)।

দ্বাদশ অধ্যায়

# সালাত বা নামাজ

আমরা ঈমান সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করেছি। ঈমানের তাৎপর্য পবিত্র কালেমায় নিহিত রয়েছে। তা হলো, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোনও উপাস্য আমাদের নেই এবং হযরত মুহম্মদ (সঃ) তাঁরই প্রেরিত সর্বশেষ নবী। যে ব্যক্তি তা মুখে স্বীকার করে এবং অন্তরে বিশ্বাস করে সেই হলো মুসলমান। অধিকন্তু মুসলমানকে পূর্ববর্তী নবীগণে, রসুলদের মারফত খোদার প্রেরিত কিতাবসমূহে, ফেরেশতাতে এবং পরকালে বিশ্বাস করতে হবে। এরকম বিশ্বাস এবং বিশ্বাসের স্বীকৃতি দ্বারা কোন ব্যক্তি আনুষ্ঠানিকভাবে মুসলিম সমাজের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। অধিকন্তু তাকে কতকগুলি আনুষ্ঠানিক অবধারিত কাজও করতে হয়। রোযা এ-গুলোর অন্যতম।

## ইবাদত

কেবল বিশ্বাস দ্বারা কেউ খাঁটি মুসলমান হতে পারে না। তাকে ইবাদতের মাধ্যমে মুসলমান হিসাবে তৈরী হতে হবে। রোযা, নামায, হজ্ব, যাকাত প্রভৃতি এবাদত দ্বারা মানুষ আল্লাহ্র নৈকট্য লাভে সমর্থ হতে পারে। তবে 'ইবাদত' বলতে আরও কিছু বোঝানো হয়। এ ব্যাপক অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তাই এ সম্পর্কে একটু আলোচনার আবশ্যক রয়েছে।

সত্যিকার ভাবে মুসলমান হতে হলে মানুষকে খোদার নির্দেশিত পথ অনুসরণ করে চলতে হবে; মহানবীর মাধ্যমে খোদাপ্রদত্ত বিধিনিষেধ তাকে পালন করে চলতেই হবে; কারণ আল্লাহ্তে বিশ্বাস করে মানুষ তাঁকে তার সৃষ্টিকর্তা মহাপ্রভু বা মুনিব বলে স্বীকার করে নেয় এবং

সে নিজেকে তাঁর সৃষ্ট একজন অধম গোলাম বলে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে নেয়। তাই তাকে গোলাম হিসেবে মুনিবের সকল প্রকার হুকুম মেনে চলতে হবে অর্থাৎ যা তিনি করতে হুকুম করেছেন তাই তাকে করতে হবে এবং যা তাকে করতে নিষেধ করা হয়েছে তা হতে তাকে বিরত থাকতে হবে। এ মুনিব-ভৃত্য সম্পর্ক রক্ষার জন্য যা সম্পাদন বা বর্জন করা হয়ে থাকে তার প্রত্যেকটিকে আরবী পরিভাষায় ইবাদত বলা হয়ে থাকে। এর অর্থ দাসত্ব। এর অপর নাম আনুগত্য।

সাধারণ কথায় ইবাদত বলতে নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদিকে বোঝানো হয়। তবে মুনিব ভৃত্য সম্পর্কের ব্যাপারে তা ব্যাপক অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। খোদার আইন পালন এবং সন্তুষ্টি বিধানের জন্য মুসলমানদের যে কোন কাজই ইবাদত। খোদার সম্বন্ধে ভালো চিন্তা ভালো ধারণা পোষণ করাও এক প্রকার ইবাদত। তাঁর সৃষ্ট জগতের প্রতি সুক্ষ্ম দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাঁর গুণ-গরিমা উপলব্ধি করাকেও ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করতে হবে। আল্লাহ্‌র সৃষ্ট মানুষের মধ্যে যে পারস্পরিক সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে তা মূলতঃ ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব এবং সাম্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। সৃষ্টিকর্তা মানুষের দেহ ও মনকে একই উপাদানে সৃষ্টি করেছেন। মানুষ যাতে পরস্পরের মধ্যে এ ঐক্য এবং ভ্রাতৃত্বের সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারে এবং বজায় রাখতে পারে, তজ্জন্য আল্লাহ্‌তালা বহু আদেশ-নিষেধ জারি করেছেন। এ সব আদেশ-নিষেধ মানুষের জান, মাল ও মর্যাদার রক্ষাকবচ হিসেবে রয়েছে। এ মানবাধিকার সংক্রান্ত বিধি-নিষেধগুলি মুসলিম, অমুসলিম সকলের বেলায়ই প্রযোজ্য। তাই এ বিধি-নিষেধগুলি পালন করাও ইবাদত।

যদি কোন মুসলমান নিঃস্বার্থভাবে এবং খোদার মনস্তুষ্টি লাভের জন্য গরীব, অসহায় এবং নিরাশ্রয়কে সাহায্য করে, ক্ষুধার্তকে অন্ন দান করে, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দান করে, রুগীর সেবা করে, তবে তার এ-রকম কাজও ইবাদতের পর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য হবে। খোদার আইনের পরিপ্রেক্ষিতে

সদুপায় অবলম্বন করে যদি কোন মুসলমান নিজের এবং পরিবার-পরিজনের জীবিকা নির্বাহের জন্য অর্থনৈতিক কার্যকলাপে আত্মনিয়োগ করে, তবে তাঁর এ কার্যাবলীও ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে। এমনিভাবে যে মুসলমান তাঁর পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবের প্রতি খোদাপ্রদত্ত আইন অনুযায়ী আচরণ করেন, তাঁর এ আচরণকেও ইবাদত বলে গণ্য করা হবে। তাই ইসলামী দায়িত্ব পালন করার অর্থ হলো জীবনের যে-কোনও পর্যায়ে এবং যে-কোন কার্যক্ষেত্রে খোদার ভয়ে মন্দ কার্য হতে বিরত থাকা এবং তাঁরই সন্তুষ্টি বিধানের জন্য ভাল কাজ করে যাওয়া। এ উদ্দেশ্য সাধনের ট্রেনিং লাভের জন্য কতকগুলি আনুষ্ঠানিক ইবাদত মুসলমানদের ওপর ফরয বা অবশ্য করণীয় বলে নির্ধারিত করা হয়েছে। এ-সব আনুষ্ঠানিক ইবাদত যতই নিষ্ঠার সাথে সম্পাদন করা যায় ততই বিশ্বাসীদের আদর্শবাদ এবং অভ্যাসের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হতে থাকে। তাই এ-সব ইবাদত ইসলামের স্তম্ভ (Pillars of Islam) বলে অভিহিত হয়ে থাকে। এ-সব ইবাদত হলো নামায, রোযা, হজ্জ এবং যাকাত।

## নামাযের তাৎপর্য

নামায বলতে আমরা সাধারণতঃ নির্ধারিত দৈনিক পাঁচবার নামায পড়ার কথাই বুঝে থাকি। এ পাঁচবার নামায প্রত্যেক বিশ্বাসী মুসলমানকে পড়তেই হবে। তবে নামায বলতে আরও বহু রকমের নামাযের কথাও আসে যেমন: তাহাজ্জোদ, এশরাক, আওয়াবীন, ইত্যাদি বহু রকমের সুন্নাত এবং নফল নামায। নামায মানুষকে আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে থাকে বলেই আওলিয়া-আম্বিয়াগণ সবাই পাঁচ ওয়াক্ত নির্ধারিত নামায ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকার নামায আদায় করতেন এবং রাত জেগে নামায আদায় করতেন।

নামাযের মাধ্যমে বিশ্বাসী মুসলমান খোদার সঙ্গে তাঁর আত্মিক যোগসূত্র স্থাপন করে থাকেন। এ জন্য "নামাযে এসো, তোমার ভালোর জন্য বা আত্মোন্নতির জন্য (নামাযে) হাজির হও" বলে মোয়াজ্জেন

সবাইকে শিরীন সুরে ডাকতে থাকেন। প্রত্যেক নামাযের প্রত্যেক রাকাতে সুরা ফাতেহা পড়তে হয়। এ সুরার অর্থ অনুধাবন করিলে অতি সহজেই উপলব্ধি করা যাবে নামায কি ভাবে খোদা এবং তাঁর বান্দার মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে আত্মিক সম্পর্ক স্থাপন করে। এ সুরার ভাবার্থ বিশ্লেষণ করলে বলতে হয়, "হে খোদা, তুমি সকল প্রশংসার অধিকারী, তুমি নিখিল বিশ্বের পালনকর্তা, তুমি দয়ালু, দাতা, অতি মেহেরবান, তুমি শেষ দিনের প্রভু, আমরা তোমারই উপাসনা করে থাকি এবং তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি; আমাদের সহজ-সরল পথে পরিচালিত করো (বিশেষ করে) তাদেরি পথে যে পথে তোমার প্রিয় বা মনঃপূত বান্দাগণ চলেছিলেন এবং তাদের পথে আমাদের পরিচালিত করোনা যারা বিপথগামী হয়ে তোমার বিরাগভাজন হয়ে গিয়েছিল (অধঃপতনের অতল তলে তলিয়ে গিয়েছিল)"। নামাযে নিরাকার খোদার সঙ্গে কি ভাবে মানুষ আত্মিক সম্পর্ক স্থাপন করে দুনিয়ার চলার পথে নূতন কর্মশক্তি এবং কর্মপন্থার আলোকে উদ্ভাসিত হওয়ার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত থাকেন, তা এ সুরার সাধারণ ভাবার্থ হতেই বুঝা যায়। তাই খোদাভক্ত লোক দৈনিক পাঁচবার ফরয নামায ছাড়াও বহু রকমের নামায আদায় করে খোদার সান্নিধ্য লাভের জন্য প্রয়াসী হন।

দৈনিক পাঁচবার নামায আদায় করার মাধ্যমেই প্রত্যেক মুসলমান তার দৈনন্দিন কর্মময় জীবনে অন্ততঃপক্ষে পাঁচবার করে তার বিশ্বাসের ওপর শান দিয়ে থাকে। যে-কোন মতবাদ বা আদর্শবাদ কোন অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে। বিশেষ করে জনসাধারণ কোন বাহ্যিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই তার সত্যতা অনুধাবন করতে সহজে সক্ষম হয়ে থাকে। খোদার ওপর অবিচলিত বিশ্বাস মুসলমানদের এক অতি আকাঙ্ক্ষিত বস্তুই বটে। এ বিশ্বাসের বলেই তাদের প্রাথমিক যুগের রাজ্য বিস্তার সম্ভব হয়েছিল; বিশাল সাম্রাজ্যসমূহ তাদের পদানত হয়েছিল। এ বিশ্বাসে গোটা মুসলিম সমাজকে বলীয়ান করে তুলতে হলে বাহ্যিক অনুষ্ঠানের প্রয়োজন ছিল এবং প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতেই পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়েছিল।

নামাযের মাধ্যমে মানুষের মনে খোদার অনুভূতি জেগে ওঠে বলেই তা মানুষকে সমস্ত পাপাচার হতে দূরে রাখে এবং আত্মিক ও নৈতিক উন্নতির চরম শিখরে উন্নীত করে। কুরআনে বলা হয়েছে ঃ "সালাত কায়েম করো, বাস্তবিকই সালাত মানুষকে অশোভন এবং খারাপ কাজ হতে দূরে রাখে (২৯ ঃ ৪৫)"। "সালাত কায়েম করো দিনের দুই অংশে এবং রাত্রের কিছু অংশে নিশ্চয় পুণ্যসমূহ পাপসমূহকে দূর করে দেয় (১১ ঃ ১১৪)"।

নামাযের দ্বারা মানুষের বিশ্বাস একটি জীবন্তশক্তি হয়ে দাঁড়ায়। নামাযের আধ্যাত্মিক উপকারিতার কথা উল্লেখ করে মহানবী বলেন, "পাঁচ ওয়াক্ত সালাত কারও গৃহের দ্বারদেশ দিয়ে প্রবাহিত স্বচ্ছ সলিলা নদীতুল্য। গৃহকর্তা যদি সে নির্মল বারিস্রোতে প্রত্যহ পাঁচ-বার গোসল করতে থাকে তবে তার শরীরের ময়লা যেমন বিদূরিত হয়ে যায় তদ্রূপ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত কায়েম করার দরুন মানুষের পাপ-সমূহ বিদূরিত হয়ে যায়"। তিনি নামাযের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে একে 'বেহেশতের চাবি-কাঠি' বলেও উল্লেখ করেছেন। তিনি আরও বলেছেন, "বান্দার মধ্যে এবং কুফরীর মধ্যে ব্যবধান হলো নামায ত্যাগ করা (মোসলেম)"। অর্থাৎ কেউ নামায ত্যাগ করলে তার আর কুফরীতে পতিত হতে বিলম্ব থাকে না ; সে তখন এমন কাজের নিকটবর্তী হলো যে তার মূল ঈমান নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা এসে গেল। তাই নামায ঈমানের প্রাচীর বা রক্ষাকবচস্বরূপ।

## নামাযের নিয়ম-কানুনের তাৎপর্য

নামাযের মাধ্যমে কিভাবে খোদার অনুভূতি মানুষের মনে জাগতে পারে তা নামাযের নিয়ম পদ্ধতির প্রতি লক্ষ্য করলে সহজেই বুঝতে পারা যায়। নামাযের পূর্বক্ষণে নামাযীকে বাহ্যিকভাবে হাত-মুখ-পা প্রক্ষলন করে (ওযু করে) পাক-পবিত্র হতে হয়। এমন কি তার পরিধানের কাপড়ের পবিত্রতার দিকেও তাকে নযর রাখতে হয়। অতঃপর তাকে কেবলামুখী হয়ে পৃথিবীর যাবতীয় কাজ-কর্ম এবং চিন্তা হতে মনকে

বিরত করে এক আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হতে হয়। এরপর নামাযীকে নামাযে আনুষ্ঠানিকভাবে উঠাবসা করে, নতজানু হয়ে, মস্তক অবনত করে এবং মস্তক সংরক্ষণ করে নানাভাবে সর্বপ্রকার বিনয় এবং নম্রতার সাথে খোদার প্রশংসা এবং তাঁর কাছে সর্বপ্রকার সাহায্য প্রার্থনা করতে হয়। সে খোদাকে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত জেনে তাঁর করুণা ভিক্ষা করতে থাকে। খোদা শেষ দিনের মালিক, তাঁর মনোনীত সত্য পথে তাকে পরিচালিত করার জন্য এবং তাঁর বিরাগভাজন হতে হয় এমন পথ থেকে তাকে দূরে রাখার জন্য সে খোদার দরবারে প্রার্থনা করতে থাকে।

নামাযে নামাযী সূরা ফাতেহা ব্যতীত কুরআনের অন্যান্য অংশ হতেও কিছু কিছু পাঠ করে থাকেন এবং মহানবীর নবুয়তের মাহাত্ম কীর্তন করে থাকেন। এভাবে নামাযী কথা এবং সর্বশরীর বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা খোদার কাছে নিজকে একান্তভাবে সমর্পণ করে তার ঐহিক এবং পারলৌকিক উন্নতি কামনা করে থাকে। এভাবে সে প্রতিদিন কর্মরত থেকেও পাঁচবার নামাযের মাধ্যমে খোদার সান্নিধ্য লাভের জন্য তৎপর থাকে। ভোরে সূর্যোদয়ের পূর্বে একবার, মধ্যাহ্নের ঠিক পরে আর একবার, অপরাহ্নে তৃতীয়বার, সূর্যাস্তের পর চতুর্থবার এবং নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে পঞ্চম বা শেষবার সে নামায পড়ে থাকে। "নিশ্চয় সালাত বিশ্বাসীদের জন্য একটি নির্দিষ্ট বিধান (৪ঃ ১০৩)"। নামায পড়ার ফলে নামাযী তার অন্তরের অন্তস্তলে এক অলৌকিক শক্তি এবং আনন্দ অনুভব করতে পারে, তাঁর ঈমান বা বিশ্বাস মজবুত হয়ে ওঠে এবং পবিত্র জীবন-যাপনে সে অভ্যস্ত হতে থাকে।

নামায মুসলমানদের আদর্শবাদেরই প্রতীক। তা তাকে বার বার তার আদর্শবাদে অভ্যস্ত করে তোলে। কাজ-কর্মের ভেতর লিপ্ত থেকেও আজানের ধ্বনি শুনা মাত্রই কেন সে নামায পড়তে ছুটে আসে? তা তার হৃদয়ে মহাপ্রভুর ভীতির এবং তাঁর আনুগত্য স্বীকার করার কর্তব্য-বোধের ফল নয় কি? নিশ্চয় মহানবীর অনুসারী হতে এবং তার নিজ কর্তব্য পালন করতে নামায তাকে অভ্যস্ত করে তোলে। তাই নামায মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের এক অতি উন্নতমানের ট্রেনিংই বটে।

## নামাযের সামাজিক এবং রাজনৈতিক তাৎপর্য

নামায মুসলমানদের মধ্যে এক সুষ্ঠু সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করে। নামাযের মাধ্যমে তাদের মধ্যে ভালবাসা এবং সমঝোতার মনোভাব জেগে ওঠে। এ জন্যই বোধহয় মহানবী নামায জামাতে আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। দিনে পাঁচবার নামাযে একত্রিত হলে মুসলমানগণ মেলা-মেশার সুযোগ পেয়ে একে অন্যের সুখ-দুঃখের বিষয় অবগত হতে পারেন এবং পারস্পরিক সহানুভূতির মাধ্যমে সমাজ সুষ্ঠু এবং স্থিতিশীল হয়ে ওঠে।

মানুষ সামাজিক জীব। মানুষ দলবদ্ধ হয়ে যে-কোন কাজ করতে অনুপ্রেরণা এবং উৎসাহ বোধ করে থাকে। তাই যদিও নামায আধ্যাত্মিক ব্যাপার, তবুও সাধারণ মানুষের জন্য সঙ্ঘবদ্ধতার অনুপ্রেরণা জুগিয়ে থাকে। তাই জামাতে নামায পড়ার গুরুত্ব এত অধিক।

আল্লাহ্ এবং তাঁর বান্দার মধ্যে আত্মিক সম্পর্ক স্থাপনের সোপান বা উপায় হিসেবে নামাযের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। মুসলিম জাহানের পীর, আওলিয়া, মহানবী, সাহাবা কেরাম সকলেই নামাযের মাধ্যমেই আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করেছিলেন; তাঁরা নামাযের দ্বারাই খোদায়ী আলোর সন্ধান লাভ করেছিলেন।

নামাযের মধ্যে একাগ্রচিত্তে খোদার প্রতি বিনয়, ভীতি এবং ভক্তি প্রদর্শন করতে হয়। একে নামাযের প্রাণ বলা যেতে পারে। কেননা নামাযে প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত মনকে বিনয় ও ভীতির সাথে আল্লাহ্‌র সামনে হাযীর রাখা এবং তাঁর ধ্যানে তন্ময় করে রাখাই নামাযের আসল উদ্দেশ্য। মহানবী ও সাহাবা কেরাম নামাযে এমনি-ভাবে খোদার ভাবে তন্ময় হয়ে যেতেন যে তখন তাঁরা বাহ্য-জগত সম্পর্কে কোনও জ্ঞানই রাখতেন না। তাঁরা নামাযে বিনয় ও নম্রতার সাথে খোদার ধ্যানে বিভোর হয়ে থাকতেন। তাঁরা এবং ওলিয়ে কেরাম নামাযে এত আত্মিকস্বাদ পেতেন বলেই তাঁরা অধিকভাবে এবং রাত্রি জাগরণ করে নফল নামায আদায় করতে ভালবাসতেন।

নামাযের মাধ্যমে মুসলমানদের মিলনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মহানবী কেবল জামাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করার নির্দেশ দিয়ে ক্ষান্ত হন নি; তাঁর নির্দেশক্রমে যে-কোন মসজিদের এলাকাস্থিত মুসলমানদের দিনে পাঁচবার ছাড়াও সপ্তাহের প্রতি শুক্রবার একবার জুমার নামায মসজিদে গিয়ে আদায় করতে হয়। আবার কয়েক এলাকার মুসলমানদের একই স্থানে একত্রিত হয়ে বৎসরে দু'বার ঈদের জামাতে হাজির হয়ে নামায আদায় করতে হয়।

নামাযে সকল মুসলমানকেই সারি বেঁধে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একই ইমামের পেছনে দাঁড়াতে হয়। বড়-ছোট, ধনী-নির্ধন, মুনিব-ভৃত্য, কালো সাদা কোনও ভেদাভেদ থাকে না। মুনিব চাকরের পদপ্রান্তে যমীনে লুটিয়ে পড়ে খোদার উদ্দেশ্যে সেজ্‌দা করতে থাকে। জামাতে এসে প্রতিটি মুসলমানের হৃদয়ে সাম্য, ভ্রাতৃত্ব এবং একতার ভাব জেগে ওঠে। আবার এক ইমামের পেছনে নামায আদায় করতে অভ্যস্থ হয়ে তারা শৃংখলা রক্ষা করতে এবং মনোনীত নেতার আনুগত্য স্বীকার করতেও অভ্যস্থ হয়ে ওঠে।

নামাযের মাধ্যমে ভ্রাতৃত্ব, সাম্য, ভালবাসা এবং একতার শিক্ষা মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনে রূপায়িত হতে থাকলে তা একদিন বিশ্ববাসী মহা একত্বের ভিত্তি হয়ে দাঁড়াতে পারে এবং মানবীয় সভ্যতার স্থায়িত্ব এনে দিতে পারে।

নামায মানুষের কর্মে প্রেরণা যুগিয়ে থাকে, শিথিলতা আনে না। সক্রিয় এবং একনিষ্ঠভাবে কর্মময় জীবনের চলার পথে খোদার দয়া এবং সাহায্য ভিক্ষাই নামাযের মূল কথা। সঙ্কটে, বিপদে নামায এক উৎকৃষ্ট অনুপ্রেরণারই প্রতীক। তাই যুদ্ধক্ষেত্রের সঙ্কট মুহূর্তে সুলতান নূরুদ্দীন জঙ্গী, সম্রাট আওরঙ্গজেব প্রমুখ খোদাভীরু মুসলিম বীর যোদ্ধাগণ নামাযে সেজদায় পড়ে খোদার অনুগ্রহ ভিক্ষা করে অনুপ্রেরণা লাভ করতেন। কুরআনে বলা হয়েছে, "ওহে বিশ্বাসীগণ, তোমরা নামায এবং ধৈর্যের দ্বারা চেষ্টা কর (২ঃ ১৫৩)"। "মানুষ যা চেষ্টা করবে তা ব্যতীত তার আর কিছু প্রাপ্য হয় না এবং শীঘ্রই তার চেষ্টা পরিদৃষ্ট হবে;

অতঃপর এর জন্য পরিপূর্ণভাবে পুরস্কৃত হবে (৫৩ : ৩৯—৪১)"। মহানবী এবং সাহাবিগণ নামাযের মাধ্যমেই তাঁদের কাজের প্রেরণা লাভ করতেন। তাঁরা রাত্রের দুই তৃতীয়াংশ, অর্ধাংশ বা এক তৃতীয়াংশ নামাযে অতিবাহিত করতেন। অথচ তাঁদের চেয়ে বেশী কর্মময় জীবনযাপন কেউ করে নি।

নামায অবহেলিত আরববাসীকে এক ইতিহাস প্রসিদ্ধ জাতিতে পরিণত হতে সাহায্য করেছিল; মানব জীবনের সর্ববিধ প্রগতির ক্ষেত্রে অলস নিষ্কর্মা লোককে তা সক্রিয় ও অদম্য কর্মবীর করে তোলে। নামায প্রকৃতই সুপ্ত শক্তিকে জাগিয়ে দেয়।

## টীকা প্রসঙ্গ ও গ্রন্থালোচনা

১। প্রথম অংশে ফযরের নামায, দ্বিতীয় অংশে জোহর এবং আছরের নামায এবং রাতের প্রথম অংশে মাগরিব এবং এশার নামায।

২। মওলানা মুহাম্মদ আলী The Religion of Islam.

ত্রয়োদশ অধ্যায়

# ছাওম বা রোযা

## রোযার অর্থ

ইসলামের ভিত্তিসমূহের মধ্যে রোযা একটি অন্যতম ভিত্তি এবং অন্যতম ইবাদত। নামাযের পরেই রোযা মুসলমানদের ওপর ফরয বা অবশ্য কর্তব্য।

'ছাওম' আরবী শব্দ; বহু বচনে 'ছিয়াম'। ছাওমের অর্থ বিরত থাকা। সূর্যোদয় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সর্বপ্রকার পানাহার এবং স্ত্রী-সহবাস হতে বিরত থাকার নাম রোযা।[১]

## রোযার ঐতিহাসিক পটভূমি

প্রতিষ্ঠানিক ইবাদত হিসেবে রোযা পূর্ণ (চান্দ্র মাসের হিসাব অনুসারে) একমাস মুসলমানদের ওপর ফরয করা হয়েছে মুসলমানদের পূর্ববর্তীদের ওপরও রোযা রাখার বিধির প্রচলন ছিল। তবে রোযার সংখ্যা বা রোযা রাখার নিয়ম-কানুন স্বতন্ত্র ছিল। কুরআনে বলা হয়েছে, "ওহে বিশ্বাসিগণ তোমাদের ওপর রোযা ফরয করা হয়েছে যেমনিভাবে তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ওপরও তা করা হয়েছিল। যাতে তোমরা 'মোত্তাকী' হতে পার (অর্থাৎ খারাপ কাজ হতে বেঁচে থাকতে পার) (২ : ১৮৩)"। "আল্লাহ্ মোত্তাকিগণকে ভালবাসেন (৩ : ৭৫ ; ৯ : ৪,৭)"।

পবিত্র কুরআন রমযান মাসেই সর্বপ্রথম হযরত মুহম্মদ (সঃ)-এর নিকট অবতীর্ণ হয়েছিল (২ : ১৮৫)। তাই মুসলমানদের আধ্যাত্মিক উন্নতি-বিধানকল্পে রোযা রাখার নিয়ম এ মাসেই প্রবর্তিত হয়।

### রোযার তাৎপর্য

আত্মসংযম ও আত্মপ্রতিষ্ঠা করাই রোযার প্রকৃত উদ্দেশ্য। একাধারে একমাস রোযা রেখে প্রত্যেক মুসলমানকে আত্মশুদ্ধি লাভ করতে হয়। আত্মশুদ্ধি ব্যতীত খোদার নৈকট্যলাভ করা যায় না। আত্ম-কামনা পরিত্যাগ করতে না পারলে আত্মশুদ্ধি সম্ভবপর নয়। রোযা মানুষকে কামনা এবং লোভের কবল হতে মুক্ত করে। কুরআনে বলা হয়েছে, "যারা রিপুগুলিকে দমন করে খাঁটি পথে অটল থাকবে তাদের অগণিত পুরস্কার প্রদান করা হবে (৩৯ : ১০)"। মহানবী বলেছেন, 'ছবর ঈমানের অর্ধেক, আর ছবরের অর্ধেক রোযা' তিনি আরও বলেছেন, 'রোযা অন্যান্য সকল ইবাদতের প্রবেশদ্বার'। এর কারণ এই যে, রোযা রিপু এবং কামনাকে খর্ব করে দেয়। কামনা সকল ইবাদতের প্রতিবন্ধক। তৃপ্তির সাথে আহার করলে কামনা প্রবল হয়, আর ক্ষুধা সে কামনাকে বিনাশ করে দেয়। তাই লোভ ও কামনাকে দমন করে অন্তরকে পবিত্র করাই রোযার উদ্দেশ্য।

### রোযা ঈমানের প্রকৃত প্রতীক

রোযা ঈমানের এক ভীষণ পরীক্ষাই বটে। ভোর হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোযাদার এক ফোটা পানি বা শস্যকণা পরিমাণ খাদ্যও স্পর্শ করেনা। ক্ষুদা-তৃষ্ণার জ্বালায় ছটফট করেও এবং খাদ্য বা পানীয়বস্তু সামনে থাকা সত্ত্বেও সে কিছুই গ্রহণ করে না। এ তার খোদা-ভীতি এবং পরকালে বিশ্বাসের ফল নয় কি? কেননা এ তার অন্তরের কাজ। লোকচক্ষু হতে সম্পূর্ণ গুপ্ত। কাজেই এর মধ্যে লোক দেখানোর কোনও অবকাশ নেই। রোযাদার ইচ্ছা করলে গোপনে লোকচক্ষুর অন্তরালে পানাহার করতে পারে। অন্যের তা বুঝবার সাধ্য নেই। নামায বাহ্যিকভাবে আদায় করতে হয়; জামাতে পড়তে গেলে এবং একাকী পড়তে হলেও সবাই দেখতে পায়। কিন্তু কে রোযা রাখলো বা কে না রাখলো তা অন্যের বোঝার সাধ্য নেই। চেহারা দেখেও অনুমান করা যায় না কে রোযাদার এবং কে নয়। সকলের সাথে একত্রে এফতার করা বা ভোর

রাতে পরিবার-পরিজনের সাথে পানাহার কর। রোযা রাখার প্রমাণ হতে পারে না; তা প্রচারণা বা লোক ভুলানো প্রতারণার এক জলন্ত নিদর্শনও হতে পারে।

প্রকৃত রোযাদারের খবর একমাত্র সর্বশক্তিমান সর্বজ্ঞ খোদাতালাই জানেন। যে প্রকৃত নামাযী নয় সে লোককে দেখানোর জন্য নামায পড়তে পারে। কিন্তু লোক দেখানোর জন্য কেহ রোযা রাখে না। রোযা লোকচক্ষুর অন্তরালের ব্যাপার। এজন্য খোদাতালা বলেন, "রোযা আমারই উদ্দেশ্যে রাখা হয় এবং আমি স্বয়ং তার বিনিময় প্রদান করবো" (হাদীসে কুদসী)। যদিও সমস্ত ইবাদতই সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে তথাপি রোযা বিশেষ করে তাঁর উদ্দেশ্যে নির্ধারিত যেমন সমস্ত সৃষ্ট জগত তাঁর রাজ্য হলেও কাবা ঘরকে তাঁর ঘর বলা হয়ে থাকে। রোযা সম্বন্ধে সেরূপ বুঝতে হবে।

রোযার আধ্যাত্মিক তাৎপর্য

রমযান মাসে সারা মুসলিম জাহান পুণ্যের মহিমময় আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। বিশ্বাসী মুসলমানের প্রাণ পুণ্যের আভায় যেন ভরে ওঠে। ঐশী প্রেম ও পরকালের অনন্ত সুখ লাভের বাসনা তাকে চুম্বক লোহার ন্যায় আকর্ষণ করতে থাকে। তাই সে দিবারাত্র ইবাদত করেও ক্লান্তিবোধ করে না। বেশী পুণ্যলাভের আশায় সে দিন-রাত কুরআন তেলাওয়াত করতে থাকে, ফরয রোযা রেখে পুণ্যের আশায় রাত্রে বিশ রাকাত খত্‌মে তারাবীর নামায জামাতের সাথে আদায় করে থাকে। ভোর রাতেও সে সেহরীর সময় অতিরিক্ত নামায (তাহাজ্জুদ) পড়ে থাকে। অধিক পুণ্যের আশায় সে তারাবীর নামায ছাড়াও দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযও জামাতের সাথে আদায় করতে সচেষ্ট থাকে।

রমজান মাস আত্মসংযমের মাস। আত্মোৎসর্গ আত্মসংযমেরই আরেক দিক। রমযান মাসে দান-খয়রাত করলে বেশী পুণ্যের অধিকারী হওয়া যায় বলে মহানবী বলেছেন। তাই তিনি নিজেই এ মাসে

সবচেয়ে বেশী দান করতেন বলে হাদীসে উল্লেখ রয়েছে (বোখারী)। মহানবীর অমীয় বাণীর অনুসরণ করে বিশ্বাসী ব্যক্তি মাত্রই এ মাসে অধিক পরিমাণে দান-খয়রাত করে থাকেন। তিনি দান-খয়রাত করে নিরন্নকে অন্নদান এবং বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান করে এবং অধিক পরিমাণে যাকাত আদায় করে এক অবর্ণনীয় আত্মিক সুখের অধিকারী হয়ে থাকেন। মহানবী বলেছেন, "যে রোযাদারকে এফতার করায়, সে রোযাদারের রোযা রাখার সমান পুণ্য অর্জন করতে পারবে অথচ তজ্জন্য রোযাদারের পুণ্য হ্রাস পাবে না"। সে-জন্য বিশ্বাসী মুসলিম রোযাদারকে এফতার করাতেও চেষ্টা করে থাকেন।

রোযার নৈতিক তাৎপর্য

রোযা মানুষের নৈতিকমান বহুগুণে বর্ধিত করে থাকে। প্রকৃত রোযাদারকে রোযা সর্বপ্রকার অবাঞ্ছিত কাজ হতে বিরত থাকতে অভ্যস্ত করে তোলে। রাসুলাল্লাহ্ বলেছেন, "মিথ্যা, পরনিন্দা, কুৎসা রটনা, মিথ্যা শপথ এবং কামভাবের সাথে কারও প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা—এ পাঁচ প্রকার কাজ দ্বারা রোযা নষ্ট হয়ে যায়"। তিনি আরও বলেছেন, "যে মিথ্যা কথা এবং অন্যায় কাজ বর্জন করবে না তার পানাহার বর্জন করাতে (রোযাতে) খোদার কোন আবশ্যকতা নেই (বোখারী)"। আর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, "রোযা ঢাল-স্বরূপ, সুতরাং যে রোযা রাখে সে যেন খারাপ কথা না বলে এবং খারাপ কাজ না করে এবং কেহ যদি তার সঙ্গে ঝগড়া করে বা তাকে মন্দ বলে, সে যেন বলে আমি রোযা পালন করছি" (বোখারী)। তাই প্রকৃত রোযাদার পানাহার ইত্যাদি হতে বিরত থাকে না, তিনি সর্বপ্রকার সমাজবিরোধী এবং ধর্মবিরোধী কাজ হতেও নিজকে বিরত রাখেন; পরনিন্দা, তর্ক-বিতর্ক, ঝগড়া-কলহ, মিথ্যাচার, প্রবঞ্চনা ইত্যাদি সর্ববিধ অবাঞ্ছিত কাজ হতে তিনি বিরত থাকেন। কারণ, তিনি ভাল করেই জানেন যে এসব ন্যায়বিগর্হিত কার্য দ্বারা তাঁর রোযা খোদার নিকট গ্রহণীয় হতে পারে না। শুধু তাই নয়, প্রকৃত রোযাদার অশ্লীল

বাক্য উচ্চারণ ত' করবেনই না; অশ্লীল বাক্য শ্রবণ হতেও বিরত থাকবেন; কামভাব উদ্দীপক বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত হতে তিনি স্বীয় চক্ষুকে ফিরিয়ে রাখবেন, অনর্থক বাক্যালাপ না করে নীরব থাকবেন বা আল্লাহ্‌র স্মরণার্থে পবিত্র কালাম পাঠ করবেন বা তাঁর নাম স্মরণ করতে থাকবেন।

## কষ্ট সহিষ্ণুতা এবং দায়িত্ববোধ

রমযান মাসের কঠোর পরিশ্রম এবং সংযম অভ্যাস মানুষকে তার জীবনের বাস্তবক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ করে স্বীয় কর্তব্য সম্পাদন করতে সাহায্য করে। জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে সে তার নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকে এবং সর্বপ্রকার কঠোর পরীক্ষার মধ্যে সে অবিচলিতভাবে স্বীয় কর্তব্য সম্পাদনে সক্ষম হয়। তাকে দেশরক্ষা বাহিনীতে কাজ করবার দায়িত্ব দেওয়া হলে সে যে-কোন অবস্থাতেই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে না; আহার-নিদ্রা ত্যাগ করেও যদি তাকে দীর্ঘকাল সংগ্রাম করতে হয় সে তা করতে সক্ষম হবে এবং নিজ দায়িত্ব পালন করতে সে এতটুকুও দ্বিধা-বোধ করবে না। নিজ রিপুর ওপর তার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা অর্জিত হওয়ার ফলে সে সমাজ এবং রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব পালন করতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাকে। তার দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ খোদাকেন্দ্রিক বা সমাজকেন্দ্রিক হয়ে উঠে। আত্মকেন্দ্রিক থাকে না। স্বার্থত্যাগ এবং কষ্ট স্বীকার না করলে জনকল্যাণ সাধন করা যায় না; জনকল্যাণ সাধন না করলে খোদার সন্তুষ্টি লাভ করা যায় না। তাই কষ্ট, সহিষ্ণুতা, দায়িত্ববোধ, ত্যাগ, তিতিক্ষা প্রভৃতি রোযার প্রকৃত শিক্ষা।

## রোযার সামাজিক তাৎপর্য

নামাযের চেয়ে রোযার সামাজিক গুরুত্ব বেশী। সাধারণতঃ রমযান মাসেই কোন মুসলমান অধিক পরিমাণে জামাতে নামায পড়ে থাকেন। জামাতকে মুসলমানদের একপ্রকার আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক মিলনও বলা চলে। এখানে ধনী-দরিদ্রের মিলন সংগঠিত হয় এবং সকলেই ভ্রাতৃত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে থাকেন।

দ্বিতীয়তঃ, রোযা ধনী-নির্ধন সকলের ওপর সমভাবে ফরয ; উভয়কেই দিনে সমভাবে পানাহার ইত্যাদি হতে বিরত থাকতে হয়। তাই নীতিগতভাবে রোযা মুসলমানদের মধ্যে সাম্য, ঐক্য এবং ভ্রাতৃত্বের ভাব জাগিয়ে তোলে।

অধিকন্তু রোযা ধনীকে দরিদ্রের প্রতি বেশী সহানুভূতিশীল করে তোলে। পানাহার বর্জন করে রোযা রাখার ফলে ধনী লোক অনাহার-ক্লিষ্ট মানুষের দুঃখ সহজেই হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ হন। তাই তিনি দুস্থের সেবায় এগিয়ে আসতে আগ্রহশীল হয়ে থাকেন।

## রোযার শারীরিক তাৎপর্য

মনের সঙ্গে শরীরের অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। অধিক পুণ্যের কাজ করে রোযাদার মনে এক অপূর্ব আনন্দ অনুভব করে থাকেন। তাঁর এই আত্মিক শান্তির ফলে তাঁর শরীরও সুস্থ থাকে। রোয এবং অন্যান্য যাবতীয় ইবাদত দ্বারা বিশ্বাসীর প্রাণ খোদার প্রেমে পরিপ্লুত হইয়া থাকে। আত্মিক শান্তিলাভের দরুন তাঁর হৃদয় সর্বপ্রকার উদ্বেগের উর্ধ্বে থাকে। তাই তাঁর হৃদয়-যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাক না ; অথচ বস্তুতান্ত্রিক পৃথিবীতে আজকাল হৃদয়-যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে অকালমৃত্যু একটি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রমযান মাসে 'মুখের ওপর নিয়ন্ত্রণ' থাকে বলে মানুষের স্বাস্থ্যও ভাল থাকে। অধিক খাওয়া, অনিয়মিত খাওয়া ইত্যাদির ফলে নানাপ্রকার রোগের সৃষ্টি হয়। তাই সচরাচর দেখা যায় রমযান মাসে মুসলমান অধ্যুসিত এলাকায় রোগের প্রকোপ কম থাকে। অনেকেই আবার ব্যক্তিগত কারণে এবং বিশেষ করে স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্যও মধ্যে মধ্যে রোযা রেখে থাকে। মহানবীও বলেছেন, "রোযা রাখো স্বাস্থ্য ভাল থাকবে"।

সারাদিন রোযা রাখার ফলে রোযাদারের ক্ষুধা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে এবং এফতার করার সময় ক্ষুধার তীব্রতার দরুন খাদ্য সুস্বাদু এবং তৃপ্তিদায়ক বলে মনে হয়। এফতারের সময় রোযাদার শারীরিক এবং

আত্মিক উভয়বিধ শান্তিলাভ করে থাকে। এফতারকালীন আনন্দের অনুভূতি রোযাদার ছাড়া অন্য কেউ উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে না। যে সারাদিন ভালভাবে পানাহার করেছে, বা যে দিনের কোন অংশে যে কোন শাহী হোটেলে শাহী খানা ভোজন করেছে তার হৃদয়ের তৃপ্তির রোযাদারের সামান্য সরবৎ বা সামান্য নাস্তা দ্বারা এফতার করার তৃপ্তির কাছে অতি তুচ্ছ। তাই হাদীসে বর্ণিত আছে, "রোযাদার দু'বার তৃপ্তিলাভের অধিকারী—একবার এফতারের সময় এবং আর একবার হলো শেষদিন যে দিন সে রোযাদার তার মহাপ্রভুর সাক্ষাৎলাভ করবে"।

সারা রমযান মাস রোযা রাখার দরুন রোযাদারের পরিপাক-যন্ত্রগুলি বিশ্রাম লাভ করে পতিত জমিনের ন্যায় শক্তি অর্জন করে থাকে। পরিপাক যন্ত্রের শক্তি বৃদ্ধি আর স্বাস্থ্যের উন্নতি একই কথা।

রোযা দ্বারা শরীরের ওজন সামান্য কমে বটে, তবে তা অতি নগণ্য; বরং শরীরের অতিরিক্ত মেদ কমাতে রোযা আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের খাদ্য নিয়ন্ত্রণ (died control) অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে ডঃ গোলাম মোয়াজ্জম সাহেব কর্তৃক ১৯৬০ সালের 'মানব শরীরের ওপর রোযার প্রভাব' বিষয়ের ওপর গবেষণায় এ সত্য প্রমাণিত হয়। এতে আরও প্রমাণিত হয় যে, যাঁরা মনে করেন রোযা রাখার দরুন পেটের শূলবেদনা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে, তাঁদের এ ধারণা নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক। কারণ উপবাসে পাকস্থলীর এসিড কমে যায় এবং ভোজনে তা বৃদ্ধি পায়। সতের জন রোযাদারের পেটের রস পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, যাদের পাকস্থলীতে এসিড খুব বেশী বা খুব কম রোযার ফলে তাদের এ উভয়বিধ রোগই সেরে গেছে। যাঁরা মনে করেন রোযা দ্বারা রক্তের 'পটাসিয়াম' কমে যায় এবং সেজন্য শরীরের ক্ষতি সাধিত হয়ে থাকে, তাদের এ ধারণাও অমূলক বলে এ গবেষণায় প্রতীয়মান হয়েছে। কারণ, পটাসিয়াম কমার প্রতিক্রিয়া প্রথমে হৃৎপিণ্ডের ওপর দেখা দিয়ে থাকে, অথচ এগারজন রোযাদারের হৃৎপিণ্ড অত্যাধুনিক ইলেকট্রোকডিওগ্রাম যন্ত্রের সাহায্যে (রোযার পূর্বে এবং রোযা রাখার

পঁচিশ দিন পর) পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, রোযা যারা তাদের হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার কোন ব্যতিক্রম ঘটে নি।[২]

এক কথায় বলতে গেলে, রোযা মানব দেহের কোনরূপ অপকার সাধন করে না, বরং এর নানাবিধ উপকার সাধন করে থাকে।

## টীকা প্রসঙ্গ ও গ্রন্থালোচনা

১। ঋতুমতী, গর্ভবতী, সন্তানপ্রসবিনী নারী, পীড়িত পুরুষ বা নারী, মুসাফির (ভ্রমণ করার উদ্দেশ্যে বা যে-কোন কাজে বাড়ী হতে বহু দূরে বহির্গত ব্যক্তি) হলে রোযা ভাঙ্গিবার অনুমতি রয়েছে, তবে পরে রোযা রেখে তা পূর্ণ করে দিতে হবে। একে রোযার 'কাযা' বলা হয়।

২। চিকিৎসাবিজ্ঞানে যুগের দান : সংখ্যা আজাদ ২৮-১২-৬০ ইং।

চতুর্দশ অধ্যায়

# হজ্জ

## হজ্জের অর্থ

হজ্জ ইসলামের একটি আবশ্যিক কর্তব্য। তা সারা জীবনে একবার অবশ্য করণীয় ইবাদত। মক্কা নগরীতে অবস্থিত পবিত্র কাবাগৃহ বা বায়তুল্লাহ্ (আল্লাহ্র ঘর) যেয়ারত বা দর্শনের উদ্দেশ্যে সেখানে পৌঁছে খোদার কাছে একান্তভাবে আত্মসমর্পণ করে একাগ্রচিত্তে নানাবিধ আনুষ্ঠানিক ইবাদত করাকেই হজ্জব্রত পালন বলে অভিহিত করা হয়। তা ইসলাম ধর্মের ভিত্তিসমূহের মধ্যে অন্যতম। বিত্তশালী মুসলমানদের ওপর জীবনে একবার হজ্জব্রত পালন করা ফরয বা অবশ্য করণীয় কর্তব্য।[১]

## হজ্জের ঐতিহাসিক পটভূমি

আনুষ্ঠানিক ব্রত হিসেবে ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের বহু পূর্ব হতেই হজ্জ প্রথা প্রচলিত ছিল। সাধারণতঃ তা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) নবীর স্মৃতিরই স্বাক্ষর বহন করে। পবিত্র কুরআনে কাবা ঘরকে অতি প্রাচীন (আতীক ২২ঃ২৯) এবং পবিত্র (হারাম ও মুহাররাম ৫ঃ৯৭) ঘর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এ কাবা ঘরের অতি সন্নিকটে তাঁর প্রিয় পুত্র হযরত ইসমাঈল (আঃ)-কে বসবাস করবার উদ্দেশ্যে রেখে খোদার নিকট এই বলে প্রার্থনা করেছিলেন, "ওহে আমার প্রতিপালক মহাপ্রভু, তুমি এ শহরের (মক্কা) শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান কর এবং আমাকে ও আমার বংশধরগণকে মূর্তি পূজা হতে বাঁচিয়ে রাখ (১৪ঃ৩৫)। ওহে আমাদের

প্রভু, তোমারই পবিত্র ঘরের সন্নিকটে আমি আমার বংশধরদের একজনকে (ইসমাঈল আঃ) অনাবাদী উপত্যকায় বসবাস করতে স্থান দিয়েছি যাতে তারা (বংশধরগণ) সালাত কায়েম করতে পারে। সুতরাং তাদের প্রতি লোকদের আকর্ষণ করে দাও এবং (বিভিন্ন রকমের) ফলের মাধ্যমে তাদের রিজিক বা জীবন ধারণের ব্যবস্থা করে দাও (১৪ : ৩৭)"।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) স্বীয় পুত্র ইসমাঈল (আঃ)-কে নিয়ে কাবা ঘরের সংস্কার সাধন করে খোদার কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, "ওহে আমাদের প্রভু, (তোমারই ইবাদতের উদ্দেশ্যে) আমাদের উভয়ের পক্ষ হতে (আমাদের এ কাজ) কবুল করে নাও (স্বার্থক করে তোল) (২ : ১২৮)"। হযরত ইব্রাহীম পবিত্র কাবাঘরে নিরাকার খোদার উপাসনা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং হজ্জব্রত আনুষ্ঠানিকভাবে পালন করেছিলেন। হজ্জের আনুষ্ঠানিক ইবাদতমূলক কার্যাবলী ওহীর মাধ্যমেই নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল। হযরত ইব্রাহীমের প্রবর্তিত হজ্জ প্রথার বহু কার্যাবলী মহানবী কর্তৃক প্রবর্তিত হজ্জ প্রথাতে গৃহীত হয়েছে।

### হজ্জের আধ্যাত্মিক তাৎপর্য

সংক্ষেপে বলতে গেলে, হজ্জের অর্থ হলো হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এবং মহানবীর স্মৃতি বিজড়িত পবিত্র মক্কানগরীর কাবা গৃহ, সাফামারওয়া, মিনা, আরাফাত, মযদালেফা প্রভৃতি স্থানে তাঁদেরই অনুসরণে খোদার কাছে নিজের জন্য, নিজ বংশধরদের জন্য, পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয় এবং বিশ্বমুসলমানদের জন্য কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করা সবাইর ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক সুখ-শান্তি কামনা করা, অপরাধ মার্জনা করে পারলৌকিক শান্তি বিধান করার জন্য খোদার কাছে প্রার্থনা করা।

খোদাতালা সর্বত্র বিরাজ করেন সত্য। তবে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এবং মহানবীর ইবাদতগাহ্ হিসেবে কাবাঘরের মর্যাদা বেশী। সামাজিক, ধর্মীয় বা রাজনৈতিক যে-কোন প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রীয় অফিস সর্বত্র থাকে। সেখান থেকে বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠানের প্রচারপত্র বিলি হয়ে থাকে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করলেও

তাদের মধ্যে তাদের কেন্দ্রীয় অফিসে এসে উপদেশ-নির্দেশ এবং অনুপ্রেরণা লাভ করে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সফল করে তুলতে হয়। এ হচ্ছে সর্বত্র সব প্রতিষ্ঠানের প্রচলিত নিয়ম। হযরত মুহম্মদ (সঃ)-এর অনুসারীদেরও ধর্মীয় জগতের কেন্দ্রীয় অফিস বলতে এ কাবা ঘরকেই বোঝায়। এখান থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করে তাঁরা জীবন স্বার্থক করে তুলতে পারেন। মহানবীর অন্তর্ধান হলেও তাঁরই স্মৃতি বিজড়িত এ ইবাদতগাহ্ এবং এর পারিপার্শ্বিক পবিত্র স্থানসমূহে গেলে সবাইর মনে তাঁর উপস্থিতির অনুভূতি জাগতে থাকে এবং তাঁর প্রবর্তিত ইসলামী জীবন ব্যবস্থার প্রতি হৃদয়ে শ্রদ্ধা ও ভক্তি জাগ্রত হয়। তাই হজ্জ মুসলমানদের আধ্যাত্মিক জীবনের চরম উন্নতি সাধন করে তাদের অন্তরে পারলৌকিক সুখের অনুভূতি জাগিয়ে তোলে।

পবিত্র হজ্জ উপলক্ষ্যে খোদার নৈকট্য লাভের আশায় অনুপ্রাণিত হয়ে দূর-দূরান্তর হতে বহু কষ্ট স্বীকার করে মুসলমানগণ পবিত্র কাবার উদ্দেশ্যে এসে একত্রিত হয়ে থাকেন। আপন পরিবার-পরিজনের বা কায়ক্লেশের কথা ভুলে গিয়ে তাঁরা এখানে খোদার প্রেমে ভাবাপ্লুত হয়ে রুদ্ধকণ্ঠে তাঁর মহীমা কীর্তন করে তাঁর দয়া প্রার্থনা করে থাকেন। ধনী-নির্ধন, আশরাফ-আতরাফ বা উচ্চ-নীচ, আফ্রিকার কৃষ্ণকায় নিগ্রো মুসলমানই হউক, আর ইউরোপীর গৌরকায় কোন মুসলমানই হউক না কেন, সকলেই আজ একই রকম সাদা পোশাক পরিধান করে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এবং সারিবদ্ধ হয়ে খোদার কাছে তাদের ইহকালীন এবং পরকালীন অনুগ্রহ ভিক্ষা করে থাকেন। তাঁরা পবিত্র স্থানের সন্নিকটবর্তী হয়েই সমস্বরে বলতে থাকেন, "হে খোদা তোমার আদেশে আদিষ্ট হয়ে আমরা আজ এখানে হাযীর হয়েছি (লাব্বায়েক), তোমার কোনও অংশীদার নেই, তুমি অদ্বিতীয় ও মহিমান্বিত। আমরা তোমার আদেশ পালন করতে এ স্থানে হাযীর হয়েছি"।

কাবা ঘরের চতুর্দিকে ঘুরে ঘুরে বিশ্বাসী মুসলমান বলতে থাকেন, "হে খোদা, এ আবর্তন তোমার প্রতি আমার অগাধ বিশ্বাসের প্রতীক। তোমার প্রেরিত কিতাবের সত্যতার আস্থা স্থাপনের নিদর্শন এবং তোমার

নির্দেশ পালনের সাক্ষ্য এবং তোমার নবীর সুন্নত পালনের নিদর্শন। হে আল্লাহ, নিশ্চয় আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি—সন্দেহ, শিরিক, অবিশ্বাস, মুনাফেকী, শত্রুতা, কু-স্বভাব হতে এবং পরিবারের প্রতি, ধন ও সন্তান-সন্ততির প্রতি (অন্যের) কুদৃষ্টি থেকে। হে আল্লাহ, আমাকে তোমার আরশের ছায়ার নীচে স্থান দিও, যেদিন (কেয়ামতের দিন) তোমার আরশের ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবে না। হে আল্লাহ্ আমাকে মুহম্মদ (সঃ)-এর পানপাত্র থেকে পানীয় পান করাও যেন চিরতরে আর আমার পিপাসা না থাকে। হে আল্লাহ্ আমার হজ্জ কবুল করো আমার এ পরিশ্রম সার্থক করো। আমার পাপ ক্ষমা করো। আমার এ তেজারত চিরস্থায়ী করো। হে প্রবল প্রতাপান্বিত, হে ক্ষমাশীল, ক্ষমা কর, দয়া কর এবং যা কিছু তুমি জান (আমার পাপ সম্পর্কে) তা মাপ করে দাও। নিশ্চয় তুমি অধিক ক্ষমতাশালী এবং মহৎ। হে খোদা, হে আমাদের প্রভু, আমাদের ইহকালীন এবং পরকালীন মঙ্গল দান করো। তোমার অনুগ্রহে আমাদের কবরের শাস্তি এবং দোযখের শাস্তি হতে আমাদেরকে রক্ষা করো। হে খোদা আমি তোমার নিকট যাঞ্চা করি পোক্ত ঈমান খাঁটি এবং সৎসংকল্প, প্রশস্ত জীবিকা, (তোমার ভয়ে) ভীত হৃদয়, (তোমার স্মরণে) নিয়োজিত জিহ্বা, হালাল ও পবিত্র রুজি, নছুহার ন্যায় (গ্রহণযোগ্য) তোবা (অনুশোচনা), মৃত্যুর পূর্বে অনুশোচনা, মরণকালে শান্তি, মৃত্যুর পর ক্ষমা এবং মাফ, বিচার কালে ক্ষমা এবং নরকের অগ্নি হতে পরিত্রাণ এবং বেহেস্তে অবস্থান" ইত্যাদি ইত্যাদি। এমনিভাবে সাফা-মারওয়া, মিনা, মযদালেফা এবং আরাফাতে খোদার নিকট তাঁর কৃপা প্রার্থনা করে মুসলমানগণ তাঁদের ঐহিক এবং পারত্রিক সুখ-সমৃদ্ধি কামনা করে থাকেন।

যদিও 'মনে বা গৃহকোণে বা বনে' খোদার ধ্যান সার্থক হয়ে থাকে মনে করা হয়, তবুও বহু সঙ্গীদের মধ্যে থেকেও খোদার ধ্যান হজব্রত পালন কালেই সার্থক হয়ে থাকে। তাই খোদার প্রেমে মত্ত মুসলমানগণ নিজ নিজ স্ত্রী-পুত্র-পরিবার, ধন-সম্পদ এবং আবাসস্থান ছেড়ে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে বিনীত ভৃত্যের ন্যায় নবী-স্মৃতি বিজড়িত খোদার এ শ্রেষ্ঠ

ইবাদতগাহে এসে দিন-দুনিয়ার বাদশাহ্‌র সম্মুখে হাযীর হয়ে থাকে। খোদার উপস্থিতির ভাব এমনই তাঁদের প্রাণে সাড়া দিয়ে থাকে যে তাঁদের যে-কেউ তখন নিজ আত্মীয়-স্বজন পরিবেষ্টিত থেকেও আপনভাবে তন্ময় হয়ে থাকেন, কারও সঙ্গে বাক্যালাপ না করে একাগ্রচিত্তে খোদার ধ্যানে তন্ময় হয়ে থাকেন। সকলেই এখানে খোদার উপস্থিতি গভীর-ভাবে অনুভব করে থাকেন বলেই অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাঁর করুণা ভিক্ষা করে পরকালের শান্তি কামনা করে থাকেন। খোদার প্রথম উপাসনাগৃহ বা ইবাদতগাহ্ হিসেবে তাঁরই অনুগ্রহাসক্ত কাবা এবং তার কাছা-কাছি অন্যান্য পবিত্র স্থানগুলি বিশ্ববাসীদের প্রাণে আল্লাহ্‌র প্রত্যক্ষ উপস্থিতির অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। এ কাবা ঘরেই হযরত ইব্রাহীম ও হযরত মুহম্মদ (সঃ) খোদার প্রার্থনা করে দীন-দুনিয়ার মঙ্গল আহরণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাই হাজিগণ অশ্রুসিক্ত নয়নে খোদার ইবাতদ করে এখানে আত্মিক শান্তি লাভ করেন। হাজীদের অশ্রুধারা লক্ষ্য করে বহু ইউরোপীয় দর্শক বিস্মিত হন। হাজীদের হৃদয়ের এ অনুভূতি অন্যের বোঝার সাধ্য নেই।

আরাফাতের ময়দানে হাজীদের প্রার্থনা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। এখানে হযরত আদমের দোওয়া কবুল হয়েছিল বলে হাজিগণ এখানে নামাজান্তে বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে খোদার নিকট প্রার্থনা করতে থাকেন। মহানবী বলেছেন, ''এমন অনেক পাপ আছে, যা আরাফাতের ময়দানে দণ্ডায়মান না হলে খণ্ডিত হয় না''। তাই খোদার প্রেমে পাগল হয়ে যে হজ্জব্রত পালন করেছেন, হজ্জের সময় সর্বপ্রকার খারাপ ও অশোভন কার্য এবং বাক্য ত্যাগ করে খোদার প্রেমিক হিসেবে হজ্জ সমাধা করেছেন, রাসুলুল্লাহ্ তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, 'সে ব্যক্তি পূর্বকৃত পাপ হতে এরূপ নিষ্পাপ হয়ে যায় যেরূপ সে মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ট হওয়ার দিন নিষ্পাপ ছিল''।

সর্ব বিষয়ে খোদার আনুগত্য স্বীকার করে হৃদয়ে পবিত্রতা অর্জন করাই হজ্জের মুখ্য উদ্দেশ্য। মহানবী হজ্জকে খোদার বন্দেগী ও দাসত্ব আখ্যা দিয়েছেন। তা একদিক দিয়ে সর্বোৎকৃষ্ট ইবাদত। খোদার প্রতি

বিশ্বাস এবং ভালবাসা না থাকলে কেউ আপন পরিজন ত্যাগ করে এমন ভ্রমণে বাহির হয় না। এ সাধারণ ভ্রমণ নহে—পবিত্র মক্কাধামে এসে হজ্বযাত্রিগণ নিজেদের অস্তিত্ব ভুলে গিয়ে সম্পূর্ণ অসহায়ভাবে খোদার কাছে আত্মসমর্পণ করে থাকেন। এ-ই হলো হজ্বের মর্মকথা।

হজ্বের প্রত্যেক অনুষ্ঠানের মধ্যেই খোদার প্রত্যক্ষ উপস্থিতির অনুভূতি পরিলক্ষিত হয়। মিনাতে পাথর নিক্ষেপ কালেও তা দেখা যায়। হাজিগণ পাথর নিক্ষেপ করায় সময় খোদার সাহায্য প্রার্থনা করে এবং প্রকৃতভাবেই হৃদয়ের শয়তানকে পরাভূত করে যেন আত্মতৃপ্তি অনুভব করতে থাকেন। প্রকৃত হাজী ব্যতীত অন্য কেউ তা হয়তো অনুভব করতে সক্ষম হবে না। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) যে সব স্থানে শয়তান কর্তৃক খোদার আদিষ্ট কাজে বাধা পেয়েছিলেন এবং তাকে পরাভূত করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলে কথিত আছে, সে সব স্থানে শয়তানকে উদ্দেশ্য করে পাথর নিক্ষেপ করে হাজীরা হযরত ইব্রাহীমের স্মৃতিরই স্মারক বহন করেন এবং মনের কলুষ দূর করে পবিত্রতা অর্জন করেন।

কাবা ঘরের নিকটবর্তী হয়ে হাজীদের প্রচলিত পোশাক পরিত্যাগ করে যে (এহরামের) সাদা ও সেলাইবিহীন কাপড় পরিধান করতে হয় তা বাস্তবিকই তাদের মৃত্যুর পরবর্তী কাফনের কাপড়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এহরামের কাপড় যেমন সাদা এবং কেবল দু' টুকরো মাত্র, কাফনের কাপড়ও তদ্রূপ সাদা এবং দু' টুকরো মাত্র। আরাফাতের ময়দানে পৃথিবীর নানা দেশের বিভিন্ন লোক সমবেত হয়ে যখন দোওয়া প্রার্থনা করতে থাকে তখনকার দৃশ্যটি হাজীদের মনে বাস্তবিকই কেয়ামতের ময়দানের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রত্যেকে তখন নিজ নিজ চিন্তায় অধীর থাকে। সবাই তখন আশা ও ভয় নিয়ে এক অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে দণ্ডায়মান থেকে প্রতিক্ষণ খোদার অনুগ্রহের প্রতীক্ষায় থাকেন।

### হজ্বের সামাজিক তাৎপর্য

'একই খোদা, একই রাসুল এবং একই কাবা'র স্মৃতি বিজড়িত স্থানে একত্রিত হয়ে বিভিন্ন দেশের মুসলমানগণের মধ্যে সাম্য, ভ্রাতৃত্ব

এবং ঐক্যের ভাব জেগে ওঠে। একই সাদা পোশাকে ভূষিত এবং একই উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে এবং একই ভাষায় (আরবী) খোদাকে সম্বোধন করে তারা সাম্য, মৈত্রী এবং ভ্রাতৃত্ব বোধে উদ্বুদ্ধ হয়। হজ্ব মানুষকে একইভাবে চিন্তা করতে ও কাজ করতে এবং বসবাস করতে শিক্ষা দিয়ে থাকে।

হজ্বের সামাজিক গুরুত্ব অনুধাবন করে ঐতিহাসিক হিট্টি সাহেব বলেন যে, জগতের সকল ধর্মের মধ্যে একমাত্র ইসলাম ধর্মই এর অনুসারীদের মধ্যে জাতি বা বর্ণ-বৈষম্য দূর করতে সবচেয়ে বেশী কৃতকার্য হতে পেরেছে। কেননা এ অনুষ্ঠানটি নিগ্রো, বার্বার, চীনা, সিরীয়, তুর্ক, আরব, ধনী, দরিদ্র, উচ্চ, নীচ সকলকে একই ধর্মের অনুসারীজ্ঞানে একত্রিত করে এবং ভ্রাতৃত্বভাবে উদ্বুদ্ধ করে।[২]

হজ্বের রাজনৈতিক তাৎপর্য

রাজনৈতিক দিক দিয়েও হজ্বের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সারা বিশ্বের মুসলমানগণ হজ্ব উপলক্ষ্যে একত্রিত হয়ে তাঁদের জাতীয় বা দলীয় স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে একে অন্যকে ভাইরূপে আলিঙ্গন করে থাকেন। তাঁরা তাঁদের রাজনৈতিক বিচ্ছেদ বা বিভিন্নতা ভুলে গিয়ে একই মঞ্চে একত্রিত হয়ে থাকেন। তাঁদের কেউ রাজতন্ত্র শাসিত দেশের, কেউবা সাধারণতন্ত্র-শাসিত দেশের কেউবা সামরিক শাসনের অধীনদেশের অধিবাসী; কিন্তু এখানে এসে তাঁরা সবাই একই উদ্দেশ্যে একত্রিত বলে তুলনামূলকভাবে বুঝতে পারেন মুসলমান হিসেবে সারা পৃথিবীতে তাঁদের স্বাতন্ত্র্য রয়েছে; তাঁদের সবাইর, 'একই খোদা, একই রাসূল এবং একই কাবা'। তাঁরা হজ্ব উপলক্ষ্যে একত্রিত হয়ে তাঁদের ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে পৃথিবীতে মুসলমান হিসেবে মাথা উন্নত করে বেঁচে থাকবার এক মহা সুযোগ লাভ করে থাকেন। খুলাফায়ে রাশেদীনের সময় এবং বিশেষকরে হযরত ওমর (রাঃ)-এর সময় হজ্ব অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যেই মুসলমানদের সর্বপ্রকার গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাদি আলোচিত হতো।

## পরিশিষ্ট

ইসলাম বিশ্বজনীন ধর্ম। এর অনুসারী হয়ে মানুষ ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হবে, একে অন্যের প্রতি সহানুভূতি ও ত্যাগ-তিতিক্ষা দ্বারা সুখী বিশ্ব গড়ে তুলবে এবং পরম স্রষ্টার মাহাত্ম্য ঘোষণা করবে ইত্যাদি বহু কিছু ছিল এর উদ্দেশ্য। কিন্তু পরিতাপের বিষয় ইসলামের মহান উদ্দেশ্য আধুনিক ধনতান্ত্রিক ও স্বার্থসর্বস্ব দুনিয়ায় ফলপ্রসূ হয়নি। মানুষ স্বার্থের মোহ কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়নি। স্বার্থের বশবর্তী হয়ে সে ধর্মীয় আদর্শ ও ঐতিহ্য পদদলিত করতে কুণ্ঠাবোধ করে না, মুসলিম ভাই বলে অপর মুসলিমকে সম্বোধন করেও সে তাকে নিজ স্বার্থের তাকিদে হত্যা করতে কুণ্ঠাবোধ করে না, তার সম্পদ লুট করে এবং তাকে তার অর্থনৈতিক নাগরিক, রাজনৈতিক সবপ্রকার অধিকার হতে বঞ্চিত করতে তার এতটুকুও বিবেকে বাধে না।

আধুনিক যুগ জাতীয়তাবাদের যুগ। জাতীয় স্বার্থ ও জাতীয় ঐতিহ্য সংরক্ষণ, জাতীয় সম্পদ সংরক্ষণ এবং জাতীয় শক্তি ও সম্পদ বৃদ্ধি করা ইত্যাদি জাতীয়তাবাদের কথা। ইসলাম জাতীয়তাবাদের ওপরই ভিত্তি করে আন্তর্জাতিক বা বিশ্বজনীন সমাজ ব্যবস্থার আয়োজন করেছিল। 'সব মুসলমান ভাই ভাই'—ইসলামের এ মহা শিক্ষার ব্যতিক্রম আজ ধনতান্ত্রিক যুগে সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। এমন কি মূল ইসলামী ধারার কেন্দ্রভূমি বলে যে সব দেশ এক কালে গর্ববোধ করতো এবং এখনও যাদের ইসলামের ধ্বজাবাহক বলা হয়ে থাকে সে সব দেশের রাজনীতি বা বৈদেশিকনীতি ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ বা সংস্কৃতি বোধের ওপর নির্ভর না করে বহুলাংশে আর্থিক লাভের ওপর নির্ভর করে থাকে। এ ছাড়া সব দেশে এবং এমনকি মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের অভ্যন্তরে, রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, খুনাখুনি, সামাজিক ও ধর্মীয় দলাদলি এবং বিভিন্নতা যেন এক মহা অশান্তির ঝড় এনে দিয়েছে। কিন্তু একমাত্র হজ্ব উপলক্ষ্যেই এর ব্যতিক্রম আমরা দেখতে পাই। এখানে এসে এ বিংশ শতাব্দীতেও বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন জাতের, বিভিন্ন মযহাবের মুসলমানগণ এক হয়ে যায়। এখানে শিয়া-সুন্নি, আরব-অনারব ভেদাভেদ থাকে না। একই ইমামের পেছনে

বিভিন্ন মযহাবের মুসলমান কাবা ঘরকে সামনে রেখে নামায আদায় করে থাকে। মনে খোদা এবং রসুলের অনুভূতি জাগার ফলে এখানে কেউ কাউকে ঘৃণার চোখে দেখেন না, কেউ কথায় বা কাজে কারও মনে কষ্ট দিয়ে থাকলে পর মুহূর্তেই তাঁর হাত ধরে মাফ চেয়ে নিচ্ছেন; কারণ তাঁর ধারণা, এ পবিত্র স্থানে কোন মুসলিম ভা'য়ের প্রাণে কোনপ্রকার আঘাত দেয়া যায় না, তাতে আল্লাহ্ এবং রসুলের বিরাগ-ভাজন হতে হয়। এখানে এসে এমনকি কাবাঘর সংলগ্ন বায়তুল হারামে বাঙালী, তুর্কী, মিসরী, ইরাকী, য়্যামানী ইত্যাদি বিভিন্ন দেশের মুসলমান একে অপরের পরিচয় পেয়ে আপন ভাই বলে কোলাকোলি এবং আলাপ-আলোচনা করে কতই না আনন্দ পেয়ে থাকেন। যেন হারানো ভাইকে বহুদিন পর পেয়ে এক অনির্বচনীয় শান্তি বোধ করেন। তাই ইসলামের বিশ্বজনীন রূপ কেবল হজ্জের মধ্যেই আমরা এখনও দেখতে পাই। ইসলামের আদর্শবাদ যেন হজ্জব্রতের মধ্যেই সীমাবদ্ধভাবে রক্ষিত হয়ে রয়েছে। বর্তমান জগতে ইসলামের বিশ্বজনীন রূপ এবং এর সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শবাদ যদিও সত্যিকারভাবে কোথাও পরিলক্ষিত হয়না আমরা এখানে এসে এ অনুষ্ঠানে তা সম্যক উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়ে থাকি। শিক্ষিত এবং চিন্তাশীল হাজী মাত্রেই এ সত্য বিশেষভাবে উপলব্ধি করতে পারেন, অন্য কারো কাছে তা বোঝা সম্ভব নয়। তাই আধুনিক যুগে হজ্জ ইসলামী আদর্শবাদের এক প্রধান রক্ষাকবচই বটে।

## টীকা প্রসঙ্গ ও গ্রন্থালোচনা

১। বয়ঃপ্রাপ্ত ধনবান লোকের ওপরই হজ্জ ফরয। ধনবান লোক অসুস্থ অচল হয়ে পড়লে, অন্যের দ্বারা তা সম্পাদন করাইয়ে নিতে পারে।

২। পি. কে. হিট্টি—History of The Arabs.

পঞ্চদশ অধ্যায়

# যাকাত

## যাকাতের অর্থ

যাকাত ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ। ঈমান ও নামাযের পরেই এর স্থান। কুরআনের বহু স্থানে নামাযের পরেই যাকাতের উল্লেখ রয়েছে।

যাকাত আরবী শব্দ। এর অর্থ বৃদ্ধি, পবিত্রতা। যাকাত আদায় করার ফলে যাকাতদাতার সম্পদ কমেনা বরং বৃদ্ধি পেয়ে থাকে এবং তার অন্তর কৃপণতার কলুষ হতে বা পঙ্কিলতার আচরণ হতে মুক্ত হয়। ইসলামী শরিয়তের বিধান অনুযায়ী কোন অভাবগ্রস্থ গরীবকে নিজ সম্পদের একাংশের স্বত্বাধিকার দান করে এর লাভালাভ হতে নিজকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত করার অর্থই যাকাত।

কুরআনের বিভিন্ন স্থানে যাকাতের কথা বলা হয়েছে। "আপনি তাদের মাল হতে যাকাত গ্রহণ করুন, যা তাদের পাক এবং পবিত্র করে দেবে (৯ঃ১০৩)"। "এবং তোমরা সালাত কায়েম করো এবং যাকাত আদায় করো। আর তোমরা নিজেদের জন্য যে কোন ভাল কাজ পূর্বেই করে ফেলবে তা (তার প্রতিফল) তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট হতে পাবে (যাকাত হলো এর একটি)—২ঃ১১০"।

সারা বছর নিজের এবং পরিবারের যাবতীয় খরচ বাদ দিয়ে যদি কোন মুসলমানের নিকট বৎসরান্তে নির্দিষ্ট পরিমাণে কিছু টাকা জমা থাকে তবে তাঁকে তার শতকরা আড়াই টাকা হিসেবে গরীব-মিসকিনদের মধ্যে দান করতে হয়।

কেবল নগদ টাকার ওপরই যাকাত ফরয নয়, যাকাত মুসলমানদের প্রায় যাবতীয় মালের ওপরেই ফরয। গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া,

উট, উৎপন্ন ফসল, সঞ্চিত স্বর্ণ, রূপা, পণ্যদ্রব্য, যমীনে প্রাপ্ত গুপ্তধন এবং খনিতে প্রাপ্ত খনিজদ্রব্য ইত্যাদি সকল প্রকার মালের ওপরই যাকাত ফরয। এ সব জীব ও জিনিস নির্দিষ্ট পরিমাণের ঊর্ধ্বে থাকলে যাকাত দিতে হয়।[১]

যাকাত পূর্ববর্তী নবীদের সময়েও ফরয ছিল। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এবং তাঁর বংশধরদের সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে, "তাঁদের নেতৃত্ব দিয়েছিলাম, তাঁরা আমার আদেশক্রমে লোককে সুপথে পরিচালিত করেছিলেন এবং আমি তাঁদের ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছিলাম, ভাল কাজ করার জন্য এবং যাকাত দেয়ার জন্যে (২১ : ৭৩)"। "আমি বনি ইসরাঈলদের (ইহুদী এবং নাসারাদের) থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারও উপাসনা করবে না এবং মাতা-পিতা, আত্মীয় এয়াতীম ও মিসকিনদের প্রতি দয়া করবে আর আদায় করবে যাকাত (২ : ৮৩)"।

"হযরত ইসমাঈল (আঃ) তাঁর অনুসারীদের ওপর নামায এবং যাকাত ধার্য করেছিলেন এবং তাঁর ওপর তাঁর পালনকর্তা সন্তুষ্ট ছিলেন (১৯ : ৫৫)"। "এবং তিনি (আল্লাহ্) আমার (ইসা আঃ) ওপর সালাত এবং যাকাতের ভার অর্পণ করেছেন যতদিন আমি জীবিত থাকবো (১৯ : ৩১)"।

গরীদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন ধর্মের মূল শিক্ষা। তবে পূর্ববর্তী ধর্মসমূহ এ নীতির ওপর যে গুরুত্ব দিয়েছে ইসলাম তার ওপর তার চেয়ে বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছে। ধর্মের অপরাপর নীতির ন্যায় ইসলাম এ নীতিরও পরিবর্ধন সাধন করেছে।

## যাকাতের তাৎপর্য

যাকাত গরীবদের প্রতি ধনীদের দয়া নয়। তা গরীবদেরই প্রাপ্য। ইসলাম কোন ব্যক্তির উপার্জিত অর্থের সমস্তটাই একা তাকে ভোগ করবার অধিকার দেয় না; তা দ্বারা তাকে তার আত্মীয়-স্বজনদের সাহায্য করতে এবং গরীব ও মুসাফিরদের সাহায্য করতে এবং তার

অর্থ তার প্রয়োজনের সামান্য (সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্যের সমতুল্য) বেশী হলেই এ সকল কাজ করাকে তার ওপর ফরয করে দেয়। তার নামই হলো যাকাত।

রাষ্ট্রের দুঃস্থ জনসাধারণের সাহায্যের এ ব্যবস্থা ইসলামের আসল ব্যবস্থা নয়। মানুষের নৈতিকতার উৎকর্ষ সাধন করাই ইসলামের আসল উদ্দেশ্য যাতে মানুষ আপন বিবেকের তাড়নায় দুঃস্থের সেবায় দায়িত্ব অনুভব করে এবং স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে দুঃস্থের সাহায্যে এগিয়ে আসে। এ জন্য এ বিষয়ে কুরআন ও হাদীসে মানুষকে নানা মর্মস্পর্শী ভাষায় উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছে, "হে মমিনগণ আমি যা তোমাদের দান করেছি তা হতে তোমরা দান কর, সে দিন আসার পূর্বে যে দিন থাকবে না কোন বেচা-কেনা, থাকবে না কোন বন্ধুত্ব, থাকবে না কোন সুপারিশ (২ঃ ১৫৪)"। মহানবী বলেছেন, "নিশ্চয় তোমাদের মালের মধ্যে মানুষের হক (প্রাপ্য) রয়েছে যাকাত ব্যতীতও"।

নামায এবং রোযার মতোই যাকাত এক প্রকার ইবাদত। যাকাত-এর আদায়কারীদের মধ্যে আত্মোৎসর্গের প্রেরণার বিকাশ সাধন করে এবং তাদের স্বার্থপরতা এবং আত্মকেন্দ্রিকতার উর্ধ্বে উন্নীত করে। মানুষ মরণশীল; সে অল্প কিছু দিনের জন্য ধরাধামে এসে আবার চলে যায়। তাই খোদাতে বিশ্বাসী মুসলমান, তাঁরই উদ্দেশ্যে জনহিত-কর কার্যাদি সম্পন্ন করে পরকালের অনন্ত সুখের আশায় বেঁচে থাকে। সে তার ধন-সম্পদ বা ঐশ্বর্যের জন্য খোদার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কর্তব্য মনে করে এবং এ কৃতজ্ঞতা যাকাতের মাধ্যমেই প্রতি-ফলিত হয়ে থাকে। যাকাত তাকে স্বার্থপরতার উর্ধ্বে তোলে। খোদা-প্রেমিক মালদারগণ গরীব-মিসকিনদের মধ্যে নির্ধারিত যাকাতের চেয়েও বেশী বিতরণ করে থাকেন। কারণ তাঁরা এই আত্মোৎসর্গ নীতির মাধ্যমে মহিমময় খোদার প্রতি তাঁরই প্রদত্ত ধন-দৌলতের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আত্মিক শান্তিলাভে সমর্থ হন। বাস্তবিকই খোদার নৈকট্য লাভ করতে হলে আত্মোৎসর্গ-নীতির মাধ্যমেই করতে হয়। কৃপণতা

মহা পাপ। তা খোদার নৈকট্য লাভের পরিপন্থী। তাই তাকে হৃদয়ের মলিনতা বা সঙ্কীর্ণতা বলা হয়ে থাকে। এ মলিনতা বিধৌত করতে না পারলে খোদার ভালবাসা বা নৈকট্য লাভ সম্ভব নয়; সম্ভব নয় বলে অনন্তকালের শান্তির আশাও সুদূরপরাহত হয়। তাই বলে প্রকৃত বিশ্বাসী মালদার মুসলমান আবশ্যক বোধে তাঁর জান-মাল পর্যন্ত পরহিত সাধনে বিলিয়ে দিতে কুণ্ঠাবোধ করেন না। খোলাফায়ে রাশেদীনের কথা প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁরা একমুহূর্তও নিজের সুখ-সুবিধার কথা ভাবেন নি, সর্বস্ব সমাজের হিতার্থে বিলিয়ে দিয়েছেন। তাই যাকাত আত্মোৎসর্গের এক মহান ট্রেনিংই বটে।

অর্থ মানবজীবনের অপরিহার্য বস্তু বটে; তবে তা জীবনের আসল কাম্যবস্তু নয়। মানবজীবনের প্রকৃত কাম্য হলো চারিত্রিক উন্নতি বিধান এবং পরকালে শান্তিলাভ। পথিকের পাথেয় তার জন্য অপরিহার্য; কিন্তু তা তার মূল উদ্দেশ্য নয়। এ-ই হলো ইসলামী অর্থনীতির মূলকথা।

ইসলাম ব্যক্তিস্বাধীনতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। মানুষই তার কাজের জন্য দায়ী। কুরআনে বলা হয়েছে (সুরা বনী ইসরাঈল—১৫) "কোন বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না (বা কোন অপরাধী অন্যের অপরাধে অপরাধী বলে বিবেচিত হবে না)। ইসলাম মানুষকে তার রাজনৈতিক স্বাধীনতার ন্যায় অর্থনৈতিক স্বাধীনতাও দান করেছে। তা তার মানবীয় গুণ প্রকাশলাভের জন্য আবশ্যকও বটে, তবে ইসলাম অর্থ উপার্জন এবং অর্থ ব্যয়ের এক নির্দিষ্ট সীমারেখাও নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। তাই ব্যক্তিস্বাধীনতা বলতে সীমাহীন অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বুঝায় না। ইসলাম সুদ, ঘুষ এবং অপবিত্র (নাপাক) বস্তু দ্বারা উপার্জন করাকে হারাম করে দিয়েছে। এ ছাড়া প্রতারণা, জবর-দখল, কালোবাজারী ইত্যাদি সমাজবিরোধী কার্যাদি দ্বারা উপার্জন করাকেও ইসলাম হারাম করে দিয়েছে। তা শক্তি ও সামর্থবান লোকের পক্ষে পরের মুখাপেক্ষী বা গলগ্রহ হওয়াকেও নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। উপার্জনের সমস্ত বিধি-নিষেধ পালন করার সাথে যে যা উপার্জন করবে সে তার স্বত্বাধিকারী বা মালিক হবে। এ-ই ইসলামের বিধি। সম্পদ

যে যা লাভ করেছে তা সে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি হিসেবে সকলের পক্ষ হতেই লাভ করেছে। "আল্লাহ্‌ তোমাদের প্রতিনিধিত্ব দান করেছেন এবং তিনি দেখবেন তোমরা কি রকম কাজ করছো"।[৩] সুতরাং সব সম্পদই খোদার ; জাতির সকলেরই তাতে হক রয়েছে ; মালিক স্বেচ্ছায় তা নষ্ট করতে পারেন না, অপব্যয় করতে পারে না বা একাও তা ভোগ করতে পারেন না। তাতে আত্মীয় ও দরিদ্র প্রভৃতির হক রয়েছে।

যাকাত প্রথার দ্বারা মুসলিম সমাজ উপকৃত হতে পারে। যুক্তি ও মানবতার দিক দিয়ে দেখতে গেলেও মালদার মুসলমানদের একান্ত কর্তব্য তার গরীব-দুঃখী ভাইকে সাহায্য করা। অসহায়, বিধবা, নিরাশ্রয় এয়াতীম, গরীব, পঙ্গু, কর্মহীন ও অর্থহীন এবং জ্ঞানান্বেষণে রত গরীব ছাত্র—প্রত্যেকেই তাঁর সম্পদের দাবীদার। তিনি যদি তাদের এ অধিকার আছে বলে বিশ্বাস না করেন, তবে তাকে অতি নির্মম ও নিষ্ঠুর বলে মনে করতে হবে। ইসলাম এ-রকম স্বার্থপরতার ঘোর বিরোধী।

স্বেচ্ছায় যাকাত আদায় করে ধনবান লোক তার ঐশ্বর্যের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকে। সে বুঝতে পারে যে তার ধন-সম্পদ সবই খোদারই দান। তিনি ধন দিয়েছেন, আবার তার ইচ্ছায় তা নিয়েও যেতে পারেন। তাই গরীব-দুঃখীকে যাকাত দিয়ে সে আত্মিক শান্তিলাভ করে থাকে।

## যাকাত এবং করের মধ্যে পার্থক্য

যাকাত মুসলমানদের মালের ওপর কর বা ট্যাক্স নয়, তা হলো একটি অর্থভিত্তিক ইবাদত। তা ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের একটি স্তম্ভ। এ কারণেই অমুসলিম নাগরিকদের ওপর তা বাধ্যতামূলক করা হয় নাই এবং এ কারণেই যাকাতদাতা স্বেচ্ছায় আপন মালের গোপন হতে গোপনতর তহবিলেরও যাকাত আদায় করে থাকে। গরীবের জন্য খোদারই হুকুমে আত্মোৎসর্গ করে খোদার মনতুষ্টি সাধনাকরাই এর উদ্দেশ্য বলে একে ইবাদত বলে গণ্য করা হয়। পক্ষান্তরে

করদাতা কর আদায় না করলে বা কর ফাঁকি দিলে তার ঈমানের কোন ক্ষতি হবে বলে সে মনে করে না।

করদাতা স্বয়ং করের লাভ ভোগ করে থাকে; কারণ করদ্বারা দেশ রক্ষা করা হয় এবং রাস্তা-ঘাট, পুল ইত্যাদি নির্মাণ এবং অন্যান্য জন-হিতকর কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। কিন্তু যাকাতদাতা যাকাতের কোন সুবিধা ভোগ করে না, সুবিধা ভোগ করে একা যাকাত গ্রহিতাই।

কর ধার্য করা হয় মোট সম্পদের আয়ের ওপর। আর যাকাত ধার্য করা হয় মোট মালের ওপর, যাকাতের বেলায় আয় ও মূলধনের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। ব্যবসায়ের জন্য মাল জমা করে ঘরে রাখলে বা তদ্বারা গহনা তৈরী করা হলেও তাতে যাকাত আদায় করতে হয়।

যাকাতের মধ্যে করের সমস্ত উত্তম গুণ বিদ্যমান, কিন্তু তার হার পরিবর্তনশীল নয়। কারণ, তা আল্লাহ্ এবং রাসূল কর্তৃক সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। পক্ষান্তরে করের হার দেশ, কাল ও অবস্থা ভেদে পরিবর্তিত হয়।

## টীকা প্রসঙ্গ ও প্রশ্নালোচনা

১। স্বর্ণ সাড়ে সাত তোলা এবং রূপা সাড়ে বায়ান্ন তোলা হলে তার চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাতস্বরূপ দিতে হয়। এভাবে পণ্য দ্রব্যেরও চল্লিশ ভাগের একভাগ দিতে হয়।

ধান, গম, যব, খেজুর, অঙ্গুর প্রভৃতি শস্য ও ফল-মূল বিনা সেচে বৃষ্টির পানিতে জন্মিলে অল্প হউক আর বেশীই হউক তার দশভাগের এক ভাগ যাকাত রূপে দিতে হয়। একে সাধারণতঃ আরবীতে 'ওশর' বলা হয়ে থাকে। এ সকল জিনিস সেচ দ্বারা জন্মাইলে তবে বিশভাগের এক ভাগ যাকাত রূপে দিতে হয়।

গরু, উট, ছাগল, ভেড়াকে যদি ঘাস-পানি না দিয়ে মাঠে চরিয়ে প্রতিপালন করা হয় এবং সে গুলো যদি গৃহস্থালীর কাজের অতিরিক্ত ও বিক্রির জন্য অথবা দুধ ও বংশবৃদ্ধির জন্য হয়ে থাকে, তা হলে যাকাত ফরয হয়। উট পাঁচ, গরু-মহিষ ত্রিশ এবং ছাগল-ভেড়া চল্লিশ সংখ্যায় পৌঁছালে যাকাত ফরয হয়।

যমীনে গচ্ছিত কোন সম্পদ যেমন খনিজ সোনা-রূপা পাওয়া গেলে তার এক পঞ্চমাংশ যাকাত দিতে হয়। এমন সম্পদকে 'কানয' এবং কখনও 'রেকায'ও বলা হয়।

যাকাত আদায় করা ইসলামী রাষ্ট্রেরই একটি কর্তব্য কাজ। রাষ্ট্রই তা উসুল করবে এবং যথানিয়মে গরীবদের হিতার্থে ব্যয় করবে। রাষ্ট্র না করলে মুসলিম সমাজ বা সম্প্রদায়কে তার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২। মেশকাত।

৩। মুসলিম ও মেশকাত।

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

# মুসলমানদের ধর্মীয় উৎসব

মুসলমানদের বাধ্যতামূলকভাবে বছরে দু'দিন ধর্মীয় উৎসব পালন করতে হয়। এ দু'টি উৎসব হলো, ঈদুল ফিতর্ এবং ঈদুল আয্‌হা। সাধারণ অর্থে ঈদ বলতে খুশী বোঝানো হয়। উভয় দিনে মুসলমানদের মসজিদে এবং বিশেষ করে প্রশস্ত ময়দানে দু' রাকাত নামায জামাতে আদায় করতে হয়। শুক্রবারের নামাযের স্থায় নামাযের শেষে ইমাম খোত্‌বা বা উপদেশ পাঠ করেন এবং এরপর ইমামের সঙ্গে সকলে একত্রে সর্বশক্তিমান খোদাতা'লার উদ্দেশ্যে হাত উত্তোলন করে তাঁর নিকট তাদের ঐহিক এবং পারলৌকিক সর্বপ্রকার উন্নতি কামনা করে থাকে।

উভয় ঈদের দিনেই মুসলমানগণ সাধ্যমত উত্তম পোশাকে ভূষিত হয়ে আনন্দিত চিত্তে ঈদের নামাযে একত্রিত হয়ে থাকে। নামাযের মুনাজাত শেষে সকলেই ভ্রাতৃত্বভাবে একে অন্যের সহিত কোলাকোলি করে বিদায় গ্রহণ করে।

## ঈদের তাৎপর্য

মুসলমানদের ঈদের দিনের খুশী সাধারণ খুশী নয়। এ হচ্ছে তাদের ধর্মীয় কর্তব্য সম্পাদন করার সঙ্গে সম্পর্কিত খুশী। সারা রমযান মাস রোযাদার রোযাব্রত পালন করে তার ধর্মীয় কর্তব্য সম্পাদন করতে সমর্থ হয়েছে বলে সে ঈদুল ফিতরের দিন এক অনির্বচনীয় আনন্দ অনুভব করে থাকে। যে রোযা পালন করেনি তার মনে সে আনন্দ আসতে পারে না। যে রোযা পালন করেনি, সে বাহ্যিকভাবে সমাজের

খাতিরে ঈদের উল্লাসে শরিক হয় বটে, তবে সঙ্গে সঙ্গে তার মনে একটুকু হলেও মর্মযাতনা হয়, তার বিবেক একটু হলেও তাকে দংশন করে। কারণ, সে ঠিকভাবেই জানে যে ঈদুল ফিতরের ঈদ এসেছে রোযাদারদের জন্য। তাই তার আনন্দ এবং রোযাদারের ঈদের আনন্দ এক হতে পারে না। রোযাদার খোদার আদেশ পালন করেছে এবং কঠোরভাবে এতদিন আত্মসংযম করেছে বলে সে খোদার করুণালাভে বিশ্বাসী হয়ে আজ এত আনন্দিত। তার এই আনন্দের মুহূর্তে সে তার মা-বাপ, দাদা-দাদী প্রমুখের নাম স্মরণ করেও খোদার নিকট প্রার্থনা করে থাকে। কেননা সে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে একমাস রোযা পালনের দরুন খোদার করুণা সবাইর ওপর বর্ষিত হয়েছে এবং রোযারই মাধ্যমে আজ এ শুভদিনে খোদা সবাইর দোয়া গ্রহণ করবেন।

রোযাদার এ পবিত্র ঈদের দিনে দরিদ্রকে ফেত্‌রা[১] বা নির্দিষ্ট পরিমাণ পয়সা দান করেও আত্মোৎসর্গের পরিচয় দিয়ে থাকে। ফিত্‌রা ছাড়াও যে যতটুকু পারে অতিরিক্ত দান-খয়রাত করে থাকে। অন্ন-অর্থ প্রার্থী তার কাছে প্রার্থনা জানিয়ে প্রায়ই বিমুখ হয় না। তাই এ উৎসবে ধনী-দরিদ্র সবাই অংশীদার। এ ঈদের দিনে তাই রোযাদার বাহ্যিক ও আত্মিক উভয়বিধ আনন্দেরই অধিকারী।

ঈদুল আয্‌হাতেও মুসলমানগণ সার্বজনীন উৎসবের মাধ্যমে আত্মোৎসর্গের ব্রত পালন করে আত্মিক ও সামাজিক সুখের অধিকারী হয়। এই উৎসবের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, নামাযান্তে মুসলমানগণ নিজ নিজ বাড়ীতে গিয়ে আল্লাহ্‌র নামে পশু কোরবানি করে, নিজে খাওয়ার জন্য তার গোস্ত কিছু গ্রহণ করে, আত্মীয়-স্বজনদের বাড়ীতে কিছু পাঠিয়ে দেয় এবং কিছু (এক তৃতীয়াংশ) গরীবদের মধ্যে বিতরণ করে থাকে। এ কোরবানির প্রথা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর স্মৃতির স্বাক্ষর বহন করে। কোরবানির গোস্ত নিজেদের, আত্মীয়দের এবং গরীবদের মধ্যে বিতরণ করা ছাড়াও বিশ্বাসী মুসলমান জবাইকৃত পশুর চামড়া বা এর মূল্য গরীবদের মধ্যে বা অধ্যয়নরত গরীব ছাত্রদের মধ্যে বিতরণ করে দেয়।

এ কোরবানির প্রথা খোদাপ্রদত্ত এক নির্দেশ অনুসারেই প্রবর্তিত হয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছে, "এবং আমি নির্ধারণ করেছি প্রত্যেক উম্মতের জন্য কোরবানির নিয়ম যাতে তারা আল্লাহ্‌র (আমার) নাম স্মরণ করে গৃহপালিত চতুষ্পদ পশুর ওপর" (সুরা-হজ্ব : ৩৪) এ আয়াতে রাসুলুল্লাহ্‌ এবং মুসলমানদের নিজ নিজ এলাকায় কোরবানি করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাতে আরও বলা হয়েছে যে, এ কোরবানির বিধান অন্য নবীদের অনুসারীদের ওপরও প্রবর্তিত হয়েছিল। একই সুরার ২৭—২৮ আয়াতে মক্কাশরীফে হাজীদের কোরবানি করার কথা বলা হয়েছে। তাঁদের সেখানে বিশেষ সময়ে কোরবানি করতে হয় (মুয্‌দালাফা থেকে এসে প্রথম কঙ্কর নিক্ষেপের পর)।

## কোরবানির তাৎপর্য

মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। মানুষের উপভোগের জন্য এবং তার কাজের জন্য আল্লাহ্‌তালা সৃষ্টির পশু-পাখী গাছ-পালা ইত্যাদি নিয়োজিত করেছেন। মানুষ তার ইচ্ছানুযায়ী সবকিছু নিজ কাজে খাটিয়ে নিচ্ছে। পশুজগত দৈহিক দিক দিয়ে মানুষ হতে শক্তিশালী হয়েও মানুষের আজ্ঞাবহ দাস হিসেবে মানুষের কাজ করে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়—মানুষের যে-কোন উত্তম খাওয়া বলতে আধুনিক জগতে পশুর গোস্তের কথা বুঝিয়ে থাকে। আবহমান কাল থেকে মানুষ পশুর গোস্ত খেয়ে আসছে; এ পশু তার কতপ্রকার উপকারও সাধন করে আসছে। তাই এমন মহোপকারী জীবকে জবাইর ব্যবস্থা করে এক সার্বজনীন উৎসবের আয়োজন করা হলো। এ উৎসবে ধনী-দরিদ্র সবাই অংশীদার হলো। এ উৎসব সর্বশক্তিমান খোদাতালার নামেই পরিচালিত হলো, যিনি মানুষ-পশু সবাইর মালিক এবং সৃষ্টিকর্তা। তাই কোরবানির অন্তর্নিহিত অর্থ হলো খোদার উৎসর্গ বা ত্যাগ। মানুষের জান-মাল সবই খোদাপ্রদত্ত এবং তাই তাঁরই নামে সবকিছু উপভোগ করতে হবে। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে হবে এবং তাঁরই উদ্দেশ্যে এ সব উৎসর্গও করতে হবে। পশুসম্পদ দিয়ে এ

কোরবানিতে মানুষের কৃতজ্ঞতা এবং আত্মোৎসর্গের প্রাথমিক পর্যায় শুরু হয়ে থাকে; তাকে সমাজের তথা দেশ ও দশের বা খোদার উদ্দেশ্য সাধনার্থে প্রয়োজনবোধে নিজ স্বার্থ বিসর্জন এমনকি প্রাণটুকু পর্যন্ত বিসর্জন দিতে হবে এবং এ-ই হলো কোরবানির মর্মকথা।

কোরবানির অন্য এক তাৎপর্যও রয়েছে। মানুষকে খোদার নৈকট্য-লাভ করতে হলে তার মধ্যে যে পশুত্বের ভাব লুকিয়ে রয়েছে তা তাকে বিসর্জন দিতে হবে এবং পশু জবাই করার বাহ্যিক অর্থই হলো পশুত্বের কোরবান (বিনাশ) এবং আত্মার পবিত্রতা অর্জন।[২] কুরআনে বর্ণিত আছে, "তাদের (পশুদের) রক্ত এবং গোস্ত খোদার নিকট পৌঁছায় না। তবে (এ কোরবানির মাধ্যমে) তোমাদের (অর্জিত) তাক্ওয়া বা পবিত্রতা তাঁর নিকট পৌঁছে থাকে (২২ : ৩৭)"।

## ঈদুল আয্‌হা এবং ঈদুল ফিতরের সামাজিক তাৎপর্য

উভয় ঈদের দিনেই মুসলমানগণ বিপুল আত্মিক এবং সামাজিক আনন্দ অনুভব করে থাকে। তারা সাম্য, মৈত্রী এবং ভ্রাতৃত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে পরমানন্দে একে অন্যের সাথে কোলাকোলি করে থাকে। তারা পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদ, শত্রুতা সবকিছু ভুলে গিয়ে একই স্থানে সমবেত হয়ে ভালবাসা এবং খুশীর বিনিময় করে থাকে। এ ইসলামেরই নির্দেশ এবং শিক্ষা। ঈদের দিনের এ মহা শিক্ষার কথা ভেবে সত্যই কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন,

"ভুলে যা তোর দোস্ত দুসমন হাত মিলাও হাতে
প্রেম দিয়ে কর বিশ্ব নিখিল ইসলামে মুরীদ।"

### টীকা প্রসঙ্গ ও প্রশ্নালোচনা

১। ফেতরা এক প্রকার যাকাত। রোযার ঈদের রাত পর্যন্ত ঈদের দিনের আহারাদি সেরে যে মুসলমানের নিকট কিছু খাদ্যশস্য

উদ্বৃত্ত থাকে এবং প্রয়োজনের বেশী কাপড়-চোপড়ও থাকে, তার ওপর তার আহার্য শস্য হতে অর্ধ ছা'আ বা একসের সাড়ে বার ছটাক পরিমিত গম ফেতরা হিসেবে দেয়া ওয়াজেব বা অবশ্য কর্তব্য। পরিবারের যে গৃহস্বামীর ওপর ফেত্‌রা আদায় করা কর্তব্য তাঁকে পরিবারের যতলোক আছে তাঁদের সবাইর ফেত্‌রা আদায় করে দিতে হবে।

২। মওলানা আশরাফ আলী থানভী (রঃ)—বায়ানুল কুরআন —সূরা-হজ্ব ২৭—২৮।

সপ্তদশ অধ্যায়

# ইসলামে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও জিহাদ

## প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা

ইসলামের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ওপর কুরআন এবং হাদীস বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। ইসলামে যাঁরা বিশ্বাসী তাঁদের পক্ষে ইসলামের অস্তিত্ব এবং গৌরব রক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য। আপন ধর্মীয় মতামত ব্যক্ত করা, প্রচার করা, ধর্মীয় ঐতিহ্য রক্ষা করা ইত্যাদিতে মানুষের অধিকার রয়েছে। এমন কি এ বিংশ শতাব্দীতেও কেউ কারও ধর্মমত নিয়ে মাথা ঘামায় না। কোন মানুষ বা জাতি তার ধর্ম নিয়ে যে ভাবে থাকতে চায়, ধর্মীয় আদর্শ অক্ষুণ্ণ রেখে চলতে চায়, ধর্মীয় আদর্শ প্রচার করতে চায় কেউ তাতে আপত্তি করে না—করতে পারে না এবং করবার অধিকারও রাখে না। কিন্তু এ সহনশীলতা সভ্যজগতে বহু যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলেই এসেছিল। ইউরোপে ধর্মের নামে বহু রক্তপাত হয়েছে এবং বহুদিনের সংগ্রামের ফলে কুরআন প্রদর্শিত মহা শিক্ষা,— "ধর্মে কোন জোর-জবর নেই" (২ : ৫৬)। "তোমার ধর্ম তুমি পালন করো, আমার ধর্ম আমি পালন করবো" (৬ : ১০২) খ্রীস্টান জগত অবশেষে আন্তর্জাতিক সন্ধি করে স্বীকার করে নিলো (Treaty of West Phalia 1648 Ps)। এভাবে ইউরোপের বুকে শান্তি নেমে এলো। খ্রীস্টান ধর্মের প্রচারও বন্ধ হয়নি, আজও সর্বত্র তাদের প্রচার চলছে, কিন্তু তাতে কারও আপত্তি নেই। যে যার বিবেক নিয়ে কাজ করবে স্বাধীনভাবে ধর্মীয় জীবন-যাপন করবে, তাতে কারো আপত্তি থাকার কথা নয়।

ইসলাম বিশ্বজনীন রূপ নিয়ে এসেছিলো। এতে জগতবাসীকে জানবার মতো মূল্যবান আদর্শ নিহিত ছিল। তাই মুহম্মদ (সঃ) নবী হিসেবে সবাইকে ইসলামের ডাক দিয়েছিলেন। প্রথমে এতে কেউ সাড়া দিয়েছে, কেউ দেয় নি; তাতে তাঁর ভ্রূক্ষেপও ছিল না। তিনি শান্তির বাহক হিসেবে এসেছিলেন; শান্তির পথ ধরে শান্তির বাণী নিয়ে চলেছিলেন; মক্কাবাসীদের প্রথম দিকের দুর্ব্যবহার এবং উৎপীড়নেও তিনি বিচলিত হন নি। তিনি তাঁর অনুগামীদের নিয়ে মদীনায় গিয়ে সেখানে এক রাষ্ট্র গঠন করলেন; কিন্তু মক্কাবাসিগণ তাঁর মানবাধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ করলো। তারা তাঁকে, তাঁর অনুগামী সবাইকে নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে মদীনা আক্রমণ করলো। একবার নয়, দু'বার নয় কয়েক বার। তাই বাধ্য হয়ে নিজের প্রাণ রক্ষার তাকিদে, আদর্শ রক্ষার দায়ে তাঁকে তাদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। মক্কাবাসিগণ বহুসংখ্যক অস্ত্রধারী সৈন্য নিয়ে বদর, ওহদ ও খন্দক এবং বিভিন্নস্থানে মুসলমানদের নিধন করতে চেষ্টা করেছিল। তাই এসব বিধর্মী মক্কাবাসীদের আক্রমণ হতে আত্মরক্ষার্থ মুসলমানগণকে অস্ত্রধারণ করতে হয়েছিল।[১] আত্মরক্ষার জন্য আততায়ীকে নিধন করা যেমন সঙ্গত, সে-রূপ ধর্মীয় স্বাধীনতা বিনষ্টকারীকে যথোপযুক্ত শাস্তি দেয়াও সঙ্গত। আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করা প্রসঙ্গে কুরআনে বলা হয়েছে, 'যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয় তারা অত্যাচারিত বলে তাদের (যুদ্ধের) অনুমতি দেয়া হলো। আর এটা নিশ্চিত যে আল্লাহ্ তাদের জয়যুক্ত করতে যথেষ্ট ক্ষমতাবান। (অত্যাচারিত তারা) যাদেরকে তাদের দেশ হতে অন্যায়ভাবে বহিষ্কৃত করা হয়েছে। শুধু এ কথা বলার জন্য যে, আমাদের রব (প্রভু) আল্লাহ্" (২২ : ৩৯)। মক্কার বিধর্মীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রসঙ্গে আরও বলা হয়েছে, "তারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা থেকে ক্ষান্ত হবে না যে পর্যন্ত না তারা তোমাদেরকে তোমাদের ধর্ম থেকে ফিরিয়ে নিতে পারবে (২ : ২১৭)"।

মক্কাবাসীদের এমন ধ্বংসাত্মক আক্রমণের মুখে মুসলমানগণ যদি যুদ্ধ না করতেন, যুদ্ধ করার আদেশ না পেতেন, তবে পৃথিবীতে শান্তি

বা ধর্মীয় স্বাধীনতা বলতে কিছুই থাকতো না। নিরাকার খোদার উপাসনা বন্ধ হয়ে যেতো এবং তাঁর ভজনালয় বিধ্বস্ত হয়ে যেতো। এমতাবস্থায় যুদ্ধের অনুমতি নিয়ে মুসলমানদের বলা হয়েছে, "এবং তোমাদের বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করে তোমরা আল্লাহ্‌র পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, কিন্তু সীমা লঙ্ঘন করো না, কারণ, আল্লাহ্ সীমা লঙ্ঘনকারীদের ভালবাসেন না (২ঃ ১৯০)"। এ নির্দেশ মুসলমানদের আক্রমণাত্মক নীতির পরিবর্তে প্রতিরক্ষামূলক নীতির মাধ্যমে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

### জিহাদের মর্মার্থ

জিহাদ বা ধর্মযুদ্ধের উদ্দেশ্য হবে খোদারই সত্য ও ন্যায় রক্ষা প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু পররাজ্য জয়, নরহত্যা, লুঠতরাজ, জোর-জবর করে কাউকে মুসলমান করা এর উদ্দেশ্য নয়। ধর্ম ও জাতীয় নিরাপত্তা এবং মর্যাদা রক্ষা করা ইসলামী জিহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। ইসলাম তলওয়ারের দ্বারা প্রচারিত হয়নি। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মুইর বলেন, হযরত ওমর (রাঃ)-এর মেসোপোটেমিয়া দখল করার সময় পর্যন্তও 'তলওয়ার দ্বারা ধর্মপ্রচার করার' ধারণা মুসলমানদের নিকট অজানা ছিল।[২]

মুসলমানদের নিরাপত্তা ও তাঁদের ধর্মীয় অধিকার রক্ষার্থে যতটা যুদ্ধের প্রয়োজন সে প্রয়োজনের সীমায় এসে যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে। এ-ই ধর্মীয় জিহাদের মর্মার্থ। এ-রকম জিহাদ মুসলমানকে জান ও মাল দিয়া করতে হয়। প্রকৃত বিশ্বাসী হলে তাকে জিহাদে অংশগ্রহণ করতেই হবে। অর্থ দ্বারাও জিহাদ করা যায়। শারীরিক জিহাদে অংশ গ্রহণ করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই অক্ষম ব্যক্তিকে অর্থ দ্বারা জিহাদে সাহায্য করতে হবে।

ধর্ম যুদ্ধের সময় শত্রুদের শিশু, বৃদ্ধ ও স্ত্রীলোকদের ওপর সর্বপ্রকার আক্রমণ নিষিদ্ধ। মঠে, মন্দিরে বা গির্জায় উপাসনারত অমুসলমানদের ওপর আক্রমণ বা শত্রুদের বাগান, শস্যক্ষেত্র প্রভৃতি বিনষ্ট করাও নিষিদ্ধ।

ইসলাম শান্তির ধর্ম। তা মুসলমানদের বিধর্মী প্রতিবেশীদের সঙ্গে সভ্যতা ও ভদ্রতা রক্ষা করে চলার নির্দেশ দিয়েছে। কুরআনের নির্দেশক্রমে

মুসলমানগণ তা করতে বাধ্যও বটে। কুরআন বলেন, "তারা (বিধর্মীরা) সন্ধির জন্য বাহু বিস্তার করলে তুমিও তার জন্ত বাহু বিস্তার করবে এবং আল্লাহ্‌র ওপর নির্ভর করবে (৮ : ৬১)"।

## জিহাদের বিভিন্ন অর্থ

জিহাদের সাধারণ অর্থ কঠোর পরিশ্রম বা সাধনা। পরিভাষাগত অর্থে সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও প্রচারকল্পে সর্বশক্তি নিয়োগ করাকে জিহাদ বলে। কেবল যুদ্ধমূলক ব্যবস্থাতে তা সীমিত নয়; ধর্মরক্ষার্থে, ধর্মপ্রচারার্থে যে কোন ত্যাগ স্বীকার করাকেও জিহাদ বলা চলে। যাবতীয় অন্যায়, অবিচার ও অসত্যের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করাকেও জিহাদ বলে।

কুরআনের প্রচার দ্বারা অসত্যের ওপর সত্য প্রতিষ্ঠা এবং অবিশ্বাসীদের প্রাণে বিশ্বাসের সৃষ্টি করার চেষ্টাকেও কুরআন জিহাদ বলে উল্লেখ করেছে। "এবং খোদার জন্য (খোদার মহিমা প্রচারার্থে) কঠোরভাবে চেষ্টা কর এমন চেষ্টা যা তাঁর প্রাপ্য" (২৭ : ৭৮)। "সুতরাং অবিশ্বাসীদের অনুসরণ করো না এবং তাদের বিরুদ্ধে এ (কুরআন প্রচার) দ্বারা কঠোরভাবে চেষ্টা করো (জিহাদ করো)"।

নবী করিম (দঃ) হজ্জব্রত পালন করাকে অতি উত্তম রকমের জিহাদ বলেছেন (বুখারী—২৫ : ৪)। তিনি নিজ কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাকেও জিহাদ বলেছেন। এ-রকম জিহাদকে তিনি বড় রকমের জিহাদ (জিহাদুল আকবার) বলে উল্লেখ করেছেন। আত্মকেন্দ্রিক এবং স্বার্থপর লোক ধর্ম বা সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য আর্থিক বা শারীরিক কষ্ট স্বীকার করতে অনিচ্ছুক হয়। লোভ, কামনা, স্বার্থ চিন্তা ইত্যাদি দমন করতে না পারলে কোন মহৎ কাজ করা যায় না।

জ্ঞানার্জন করাকেও একপ্রকার জিহাদ বলে গণ্য করা হয়, কারণ এতে কঠোর সাধনার আবশ্যক। কুরআনে বর্ণিত আছে, "এবং যারা আমাকে উপলব্ধি করার জন্য কঠোর সাধনা করেছে, তাদের আমি নিশ্চয় উপলব্ধির পথ দেখাবো"।

## টীকা প্রসঙ্গ ও গ্রন্থালোচনা

১। ওলিয়ারী (Ol'eary) তাঁর 'Arabic Thought' নামক বইতে ইসলামের ধর্মযুদ্ধ বা জিহাদকে মহানবী (দঃ)-এর আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ বলে উল্লেখ করেছেন। টি, আরনল্ড সাহেবও তাঁর লিখিত 'Preaching of Islam' নামক মূল্যবান গ্রন্থে মুসলমানদের যুদ্ধসমূহ আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ বলে প্রমাণ করেছেন।

২। Muir—The Caliphate.

অষ্টাদশ অধ্যায়

# ইসলামে বিবাহ এবং নারীর স্থান

## বিবাহ

ইসলাম বিবাহ প্রথাকে ধর্মীয় বিধানের অন্তর্ভুক্ত করে একে এক পবিত্র অনুষ্ঠানে পরিণত করেছে। তাতে সারা বিশ্বে নারীর মর্যাদা এবং নারীর অধিকারের আদর্শ রচিত হয়েছে।

হযরত (দঃ)-এর আগমনের পূর্বে সকল দেশের এবং সর্বস্তরের লোকের মধ্যে নারীর অধিকার বা মর্যাদা বলতে কিছুই ছিল না। এমন কি, প্রাচীন গ্রীসের উন্নত এথেনীয় সভ্যতার ইতিহাসেও আমরা দেখতে পাই নারীর মর্যাদা উপেক্ষিত এবং পদদলিত। সুসভ্য এথেনীয়রা নারীকে এক "অত্যাবশ্যকীয় অভিশাপ (evil)" এবং 'সন্তান উৎপাদন করার যন্ত্র' বলে মনে করতো। তারা স্ত্রীকে অস্থাবর সম্পত্তির মতোই মনে করতো; তারা খুশীমতো তাকে হস্তান্তর করতো এবং খুশীমতো যত ইচ্ছা স্ত্রী গ্রহণ করতেও পারতো।

প্রাচীন এসেরিয়া, ব্যবিলন, মিসর এবং এমনকি প্রাচীন ভারতেও নারীর মর্যাদা ছিল উপেক্ষিত। প্রাচীন আরব, আরবের সমসাময়িক রোম এবং পারস্য সাম্রাজ্যেও একই অবস্থা ছিল। কোথাও তাদের মর্যাদার বালাই ছিল না।

মহানবী (সঃ)-এর আগমনের সাথে সাথে নারী জাতির এ দুর্দশা চিরতরে দূর হয় এবং তারা এক উন্নত আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে।

ইসলাম বিবাহকে একটি অতি পবিত্র ধর্মীয় বন্ধন বলে ঘোষণা করেছে। নারী জাতির সৃষ্টির দ্বারা খোদার মহান উদ্দেশ্য সাধিত হওয়ার কথা কুরআন ঘোষণা করেছেন। "কুরআন বলেন, ওহে মানবমণ্ডলী,

তোমরা তোমাদের বিশ্বপালককে ভয় করো যিনি একজন হতে (হযরত আদম আঃ) তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর সঙ্গিনীকে (বিবি হাওয়াকে) একই উপাদান হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁদের দু'জন হতে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন (৪ : ১)"। "আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি হলো তিনি তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের জন্য সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা তাদের মধ্যে মনের শান্তি পেতে পার (৩০ : ২১)"।

"আল্লাহ্‌ তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের থেকে তোমাদের পুত্র এবং মেয়ে সন্তান দিয়েছেন (১৬ : ৭২)"।

বিবাহ যে একটি পবিত্র বন্ধন এবং এতে যে খোদার মহান উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে তা কুরআনের এসব ঘোষণা হতে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়। নর-নারী একই উপাদানে এবং একই উদ্দেশ্যে সৃষ্ট এবং তাই উভয়ের আত্মিক গুরুত্বও অপরিসীম।

খোদাতা'লা বিবাহকে শরিয়তসিদ্ধ কার্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত করেছেন কেবল কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার সুযোগদানের উদ্দেশ্যে নয়; বরং তিনি কাম প্রবৃত্তিকে বিবাহ প্রথার স্থায়িত্বের জন্যই সৃষ্টি করেছেন যাতে কাম প্রবৃত্তি স্বামী-স্ত্রীকে পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে তাদের সন্তান প্রজননের প্রতি উৎসাহিত করে।[১] মানব-বংশের স্থায়িত্ব আল্লাহ্‌র প্রিয় ও কাম্য। মানুষের বংশ-বৃদ্ধি পাবে, তারা যুগ যুগ ধরে খোদার উপাসনা করবে, তাঁর সৃষ্টির রহস্য উদ্‌ঘাটন করে তাঁর মহিমা প্রচার করবে, এ ধরনের মহৎ উদ্দেশ্য রয়েছে মানব সৃষ্টির মূলে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র এমন মহান উদ্দেশ্যের কথা ভেবে বিবাহ করে সে মহাপুণ্য লাভের অধিকারী হবে। মহানবী বলেছেন, "যে ব্যক্তি বিবাহ করেছে সে নিজের অর্ধ ধর্মকে সুদূর দুর্গের মধ্যে রক্ষা করতে পেরেছে"। তিনি আরও বলেছেন, "তোমাদের গ্রহণ করা উচিত—আল্লাহ্‌র স্মরণকারী রসনা, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী হৃদয় এবং বিশ্বাসী বা ঈমানদার স্ত্রী। এখানে 'আল্লাহ্‌র স্মরণ' এবং 'তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা'র এ দু'য়ের

সাথে নারী গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। তাই নারীর পাণি গ্রহণ এবাদতের সমতুল্য বলে বিবেচিত।

পবিত্র বিবাহ বন্ধন মানুষের চরিত্রে স্থিতিশীলতা এনে দেয়। উভয়ের ভালবাসার মধ্যে উভয়ের আত্মিক এবং বৈষয়িক উন্নতি হয়। যে বিবাহ করেনি সে অপকর্ম হতে নিজকে রক্ষা করতে সক্ষম হলেও নিজের চোখকে কুদৃষ্টি হতে এবং অন্তরকে কুচিন্তা হতে বাঁচাতে পারে না। তাই মহানবী (দঃ) বলেছেন, "ওহে যুবকদল, যখন তোমাদের কারো স্ত্রী গ্রহণ করার সঙ্গতি থাকে, তার বিবাহ করা উচিত; কারণ তা কুদৃষ্টি দমিয়ে রাখার উত্তম উপায়, মানুষের পবিত্রতার রক্ষাকবচ এবং যার সঙ্গতি নেই সে যেন রোযা রাখে"।[২] মহানবী চিরকৌমার্যকে পরিষ্কারভাবে নিষিদ্ধ করেছেন।[৩]

খোদাতা'লা বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে এক নিখুঁত এবং নিরঙ্কুশ ভালবাসার ধারা প্রবাহিত করেছেন। তা দায়িত্বহীন ভালবাসা নয়; তার সাথে দীন-দুনিয়ার করণীয় দায়িত্বের সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। তাই খোদাতা'লা বলেন, "তাঁর নিদর্শনের মধ্যে একটি হলো তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকে সঙ্গী সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা তাদের মধ্যে শান্তি পাও এবং তোমাদের উভয়ের মধ্যে ভালবাসা এবং প্রীতির বন্ধন দিয়েছেন (৩০ : ২১)"।

বিবাহের মাধ্যমে ভালবাসা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রথমে সঞ্চারিত হয়ে থাকে, পরে সে ভালবাসা সন্তান সন্ততি এবং পরে তা নিকট আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-পড়শি এবং সর্বশেষে সমগ্র মানব জাতির কল্যাণে সাধিত হয়ে থাকে। তাই ভালবাসার মহড়া প্রথমেই নিজ বাড়ীতেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে চলতে থাকে। বিবাহের ফলে উভয়ের মধ্যে দায়িত্ববোধ জাগে, নৈতিকতার বিকাশ সাধিত হয় এবং নিজ স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে পরিবার-পরিজনের উপকার সাধন করা হতে আরম্ভ করে অপরের জন্য ত্যাগ-স্বীকার করার মনোবৃত্তি জাগে। তাই হযরত (দঃ) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম যে তার স্ত্রীর সহিত উত্তম ব্যবহার করে"।[৪]

## ইসলামে নারীর স্থান

আত্মিক এবং বৈষয়িক দিক দিয়ে ইসলাম পুরুষ এবং নারীর স্থান সমান করে দিয়েছে। ভালো কাজ করলে পুরুষ-নারী নির্বিশেষে পুরস্কার লাভের সম অধিকারী হতে পারবে। "আমি তোমাদের, নর বা নারী যে (ভাল) কাজ করবে তা ব্যর্থ করে দেবো না (৩ : ১৯৪)"। বেহেস্ত নর-নারী উভয়ের জন্যেই নির্দিষ্ট করা হয়েছে, "যে নর বা নারী ভাল কাজ করবে এবং বিশ্বাসী হবে—সেই বেহেস্তে প্রবেশ করবে (৪০ : ৪০ ; ৪ : ১২৪)"। উভয়েই সুখের জীবন-যাপন করার অধিকারী হবে। "পুরুষ অথবা নারীর যে-কেউ ভাল কাজ করবে এবং বিশ্বাসী হবে আমি তাকে সুখের জীবন-যাপন করতে দেবো (১৬ : ৯৭)"। ওহী কেবল পুরুষের নিকট আসে নি, তা মেয়ে মানুষের কাছেও এসেছিল। বিবি মরিয়ম এবং মূসার (আঃ) মায়ের নিকটও খোদার বাণী এসেছিল। কুরআনে বলা হয়েছে, "এবং তখন ফেরেস্তাগণ বলেছিলেন, ওহে মরিয়ম, আল্লাহ্‌ আপনাকে মনোনীত করেছেন এবং পবিত্র করেছেন (৩ : ৪১)"। "এবং আমরা মূসা (আঃ)-র মায়ের নিকট ওহী পাঠিয়ে বলেছিলাম, তাকে দুধ খাওয়াবে এবং যখন তার জন্য তুমি আশঙ্কা করবে তাকে নদীর মধ্যে নিক্ষেপ করবে এবং তার জন্য ভয় করো না বা কেঁদোনা (২৮ : ৭)"।

কুরআনে নারী ও পুরুষকে একে অন্যের ভূষণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআন বলেন, "তারা (নারীগণ) তোমাদের ভূষণ এবং তোমরা (পুরুষগণ) তাদের ভূষণ (২ : ১৯৫)"। মহানবী বলেন, "জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর অবশ্য কর্তব্য (ফরয)"।

নর-নারী উভয়েই সমভাবে আধ্যাত্মিক এবং মানবিক অধিকার এবং কর্তব্য আছে এবং উভয়ের জন্যই পরকালের পুরস্কার রয়েছে। কুরআনে উল্লেখ আছে "নিশ্চয় মুসলিম পুরুষ এবং মুসলিম নারীর জন্য বিশ্বাসী পুরুষ এবং বিশ্বাসী নারীর জন্য ধর্মনিষ্ঠ পুরুষ এবং ধর্মনিষ্ঠ নারীর জন্য সত্যবাদী পুরুষ এবং সতবাদী নারীদের জন্য, নর-নারীদের যারা সহনশীল তাদের জন্য, বিনম্রী নর ও নারীদের জন্য, দাতা পুরুষ ও নারীদের জন্য, রোযাদার পুরুষ ও নারীদের জন্য, পুরুষ ও নারীদের যারা নিজ

পবিত্রতা রক্ষা করে তাদের জন্য এবং পুরুষ ও নারীদের যারা আল্লাহ্‌র প্রশংসা অধিক পরিমাণে করে থাকে তাদের জন্য আল্লাহ্ ক্ষমা এবং অগণিত পুরস্কার রেখেছেন (৩৩ : ৩৫)"।

বৈষয়িক দিক দিয়েও নারী-পুরুষের সমঅধিকার রয়েছে। মুসলিম নারী টাকা উপার্জন করতে পারে, বিষয়-সম্পত্তির মালিক হতে পারে এবং ইচ্ছা করলে সে পুরুষের মতো যে-কোন কারবারও করতে পারে। "পুরুষ লোকেরা যা অর্জন করবে তারা তার সুবিধা ভোগ করবে এবং নারীরা যা অর্জন করবে তারা তার সুবিধা লাভ করবে (৪ : ৩২)"। নারীর সম্পত্তির ওপর তার সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব রয়েছে এবং সে তা ইচ্ছানুসারে হস্তান্তর করতে পারে। নারীরা পুরুষদের মতোই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়ে থাকে। "মাতা-পিতা এবং আত্মীয়-স্বজনদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষদের অংশ রয়েছে এবং মাতা-পিতা ও আত্মীয়-স্বজনদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীদেরও অংশ আছে। তা অল্পই হউক আর বেশীই হউক, এক নির্ধারিত অংশ (৪ : ৭)"।

কুরআনের একটি সুরাকে মেয়েদের নামে, "আন্-নেসা" (বা নারীগণ) বলে নামকরণ করে মেয়েদের মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়েছে। মহানবীও বলেছেন, "বেহেস্ত মায়েদের পায়ের নীচে"। "নারীই গৃহের রাণী"। কুরআন-হাদীসের এ রকম উক্তি হতে নারীর মর্যাদা ইসলাম কতদূর বৃদ্ধি করে দিয়েছে তা সহজেই অনুমান করা যায়। বিবাহ কালে স্ত্রীর দেনমোহর, যৌতুক প্রভৃতি এবং স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীর অধিকার এ-সবে নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। মহানবী আরও বলেছেন, "ঐ সকল মেয়েরা ভাগ্যবতী যাদের প্রথম সন্তান হবে মেয়ে সন্তান"।

## স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক স্থান

বিবাহ বন্ধনের ফলে স্ত্রী স্বামীর গৃহের সর্বপ্রকার কর্তৃত্বভার গ্রহণ করে থাকে। তাকে এখানে এসে নূতন দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয় বলে স্বামী-গৃহের প্রকৃত মালিক এবং কর্তা হলেও স্ত্রীকেও তার কার্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে গৃহকর্ত্রী বলা হয়ে থাকে। এক ঘরের শাসনকার্যের

অধিকারী যেন দু'জন। তার কারণ একজন যে কাজ করতে পারে অপর জন তা করতে সক্ষম নয়। শারীরিক শক্তি এবং গঠনের দরুন পুরুষরা মেয়েদের চেয়ে বেশী কষ্টসহিষ্ণু এবং বিপদের মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়। অপরপক্ষে স্নেহমমতার দিক দিয়ে মেয়েদের স্থান রয়েছে পুরুষদের উপরে; সৃষ্টির বিকাশ সাধনের জন্য এ মমতার প্রয়োজন ছিল বলে খোদাতালা তাদের এত অধিকমাত্রায় ভালবাসার প্রতীক করে দিয়েছেন। তাই পুরুষকে কষ্ট স্বীকার করে অর্থ উপার্জন করে পরিবারের ভরণ-পোষণ করতে হয় এবং নারীকে তার স্নেহ-মমতা দ্বারা সন্তান প্রতিপালন করতে হয়। প্রত্যেকে প্রত্যেকের কর্মক্ষেত্রে নিজ ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব বজায় রেখে চলবার অধিকারী।

যদিও সাধারণতঃ নারীর স্থান বাড়ীর কাজে এবং সন্তান-সন্ততির লালনপালনে নিবদ্ধ রাখার নিয়ম রয়েছে, তবুও সে যে বাইরে গিয়ে পুরুষের সাথে কাজ করেনি এবং এমনকি যুদ্ধে গিয়েও পুরুষকে সাহায্য করেনি তা নয়। ইসলামের প্রাথমিক যুগে তাদের কখনও কখনও বহুবিধ কাজ করতে হয়েছিল। তাদের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আহত এবং নিহতদেরকে সরিয়ে নিতে হয়েছিল (বুখারী—৫৬ : ৬৮); যুদ্ধে সক্রিয় অংশও গ্রহণ করতে হয়েছিল (বুখারী—৫৬ : ৬২, ৬৩, ৬৫)। স্ত্রীরা স্বামীদের খেতের কাজেও সাহায্য করতো (বুখারী—৬৭ : ১০৮) এবং ব্যবসাও করতো (বুখারী ১১ : ৪০)। এমনকি হযরত ওমর (রাঃ) কর্তৃক এক নারী মদীনার সুপারিনটেণ্ডেণ্টও নিযুক্ত হয়েছিলেন বলে জানা যায়।[৫] এ ছাড়া বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন মুসলিম দেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মেয়েদের অবদান রয়েছে। তারা শাসক এবং রাজনীতিবিদ হিসেবেও কৃতিত্ব দেখিয়েছে। "উল্লেখযোগ্য যে, মুসলিম দেশসমূহে শাসক এবং রাজনীতিবিদ হিসেবে মেয়েরা এক প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল"[৬] তবে এগুলোকে নিয়মের ব্যতিক্রম বলতে হবে। সন্তান প্রতিপালন করাই তাদের যথাযোগ্য কাজ। পুরুষদের দৃষ্টিভঙ্গিতে সন্তান প্রতিপালন করা একটি অতি দুঃসাধ্য এবং অনন্য সাধারণ কাজই বটে। আজকাল আধুনিক জগতে নারী শিক্ষার ওপর সর্বত্র জোর দেয়া হয়েছে। মহানবী (দঃ) সমভাবে

স্ত্রী-পুরুষের ওপর জ্ঞানার্জন করা ফরয বলে ঘোষণা করেছিলেন চৌদ্দ-শত বছর পূর্বেই। জাতিকে উন্নত করতে হলে শিক্ষিতা মায়ের প্রযত্নে সন্তান-সন্ততি প্রতিপালিত হওয়া একান্ত উচিত। তাদের এবং দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রচনা করতে হলে শিক্ষিতা মায়ের প্রতিপালন অত্যা-বশ্যকই বটে।

## নারীর প্রতি সদয় ব্যবহার

স্ত্রীলোকদের প্রতি সদয় ব্যবহার করার জন্য কুরআনের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ রয়েছে (২ ঃ ২২৯ ; ৪ ঃ ১৯)। এমনকি যে তার স্ত্রীকে অপছন্দ বা ঘৃণা করে তার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, "হতে পারে তুমি যে জিনিস অপছন্দ বা ঘৃণা করছো খোদাতালা তার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ভালো নিহিত করে রেখেছেন (৪ ঃ ১৯)"। মহানবী (সঃ) বলেছেন, "আল্লাহর নিকট এবং তাঁর সৃষ্ট জগতের নিকট তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম তারা যারা তাদের পরিবারের প্রতি সর্বোত্তম (ব্যবহার করে থাকে) এবং আমি আমার পরিবারের প্রতি সর্বোত্তম (ব্যবহার করে থাকি)"। "মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম সে যে তার স্ত্রীর নিকট সর্বোত্তম"। বিদায় হজ্জের সময় হযরত মুসলমানদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, "মনে রেখো, তোমাদের স্ত্রীদের ওপর তোমাদের অধিকার রয়েছে এবং তোমাদের ওপরও তাদের অধিকার আছে। তারা তোমাদের হাতে খোদার পবিত্র আমানত। তোমরা আল্লাহ্‌র পবিত্র নামে তাদের স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেছো। সুতরাং তোমরা সমস্ত দয়া এবং সহনুভূতির সাথে তাদের সঙ্গে ব্যবহার করবে ......তাদের দয়ার সাথে উপদেশ দেবে। সেই (প্রকৃত) মুসলমান যে কখনও তার স্ত্রীকে ঘৃণা করে না বা তার সাথে দুর্ব্যবহার করে না এবং যদি সে তার একটি খারাপ গুণ দেখতে পেয়ে তার ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে পড়ে, তবে সে যেন তার অপর একটি ভালো গুণ দেখে (তার ওপর) সন্তুষ্ট থাকে"।

অপর এক প্রসঙ্গে রাসুলাল্লাহ্ (দঃ) বলেছেন, "সেই সবচেয়ে বেশী আমার নিকট বেহেস্তে অবস্থান করবে যে তার মেয়েদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে এবং ভালো শিক্ষা দেবে এবং যখন তারা বয়স্কা হবে তখন তাদের মতামত নিয়ে যথাযোগ্য ব্যক্তিদের সাথে তাদের বিয়ে দেবে"।

ইসলামে বহুবিবাহ

সাধারণতঃ ইসলামে এক বিবাহের ওপর জোর দেয়া হয়েছে। তবে বিশেষ কারণে এবং অতি কঠিন শর্তাধীনে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করারও ব্যবস্থা রয়েছে। যে-কোন কারণেই হউক স্ত্রী কিন্তু একাধিক স্বামী গ্রহণ করতে পারে না। কুরআনে বলা হয়েছে, "তবে বিবাহ করবে নারীদের মধ্য হতে যাকে তোমাদের ভালো লাগে; দুই, তিন অথবা চার; যদি আশঙ্কা করো যে (তাদের প্রতি) সুবিচার করতে পারবে না, (তবে কেবল) একজনকে (বিবাহ) করবে (৪ঃ৩)"।

কুরআনের এই ঘোষণা হতে বুঝা যায় খুশীমতো চারটি বিবাহ করা যায় না; অবস্থা বিশেষে এ নিয়ম প্রযোজ্য। উদাহরণস্বরূপ স্ত্রী চির রুগ্না বা বন্ধ্যা হলে বা অন্য কোন অপরিহার্য কারণে এবং স্বামীর সমদৃষ্টি দিয়ে চলবার ক্ষমতা থাকলে, সে দ্বিতীয় পাণিগ্রহণ করতে পারে। তাই ইসলামে বহুবিবাহ একটি নিয়মের ব্যতিক্রমই বটে। এ প্রথার পরিপ্রেক্ষিতেই তখন যুদ্ধ-বিগ্রহের দরুন পিতৃহারা, স্বামীহারা, অনাথ, আশ্রয়হীনা বহু নারীর সতিত্ব বজায় রেখে জীবনধারণ করে চলার উপায় হয়েছিল। পুরুষের চেয়ে সংখ্যাধিক নারীদের বা বিশ্বযুদ্ধের দরুন সংখ্যাধিক বিধবা বা আশ্রয়হীনা নারীদের সতিত্ব রক্ষা করে চলার কি কোন বিধান সভ্য জগৎ দিতে পেরেছে? এদের অসদোপায়ে স্বীয় শরীর অপরকে বিলিয়ে দিয়ে জীবিকা অর্জন করার আশঙ্কা থেকে সভ্য জগৎ কি এদের রক্ষা করতে পেরেছে?

"ইসলাম বহুবিবাহ সমর্থন করে বলে বলা হয়ে থাকে। কিন্তু ইসলামের প্রতি সুবিচার করতে হলে দু'টি বিষয় বিবেচনা করা উচিত। প্রথমটি হলো ঐতিহাসিক। যেসব মানুষ হেদায়েতের জন্য ইসলাম

নিয়োজিত ছিল তারা ব্যাপকভাবে এক উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করছিল; তাদের মধ্যে যৌন নৈতিকতার বালাই ছিল না। এক বিবাহের নির্দেশ দিলে তখন তা নিরর্থক হতো; কেবল ক্রমান্বয়ে সংস্কার বিধান করাই তখন সম্ভব ছিল। তাই মহাজ্ঞানী এবং দূরদর্শী মহানবী (সঃ) একজন পুরুষ কেবল চারজন স্ত্রী গ্রহণ করতে পারবে বলে প্রথমে নিয়ম করে দিলেন। অতঃপর ক্রমান্বয়ে বহুবিবাহ প্রথার উচ্ছেদ সাধন করার জন্য বলা হলো, স্বামী কেবল দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করতে পারবে যদি সে সর্ববিষয়ে প্রথমা এবং দ্বিতীয়া স্ত্রীদ্বয়ের মধ্যে সমান ব্যবহার করতে সক্ষম হয়।

দ্বিতীয় বিষয় হলো সভ্যদেশসমূহের পুরুষ এবং নারীর সম্পর্ক। কোন কোন দেশে এক পুরুষ এবং এক নারীর মধ্যে যথার্থ এবং পবিত্র যৌন সম্পর্কের কথা প্রচার করা হয়ে থাকে; কিন্তু তা কোথাও কার্যতঃ দেখতে পাওয়া যায় না। 'পাশ্চাত্য জগতে এক বিবাহের প্রহসন চলছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেখানে রয়েছে দায়িত্বহীন বহুবিবাহ প্রথা। প্রেমিক যখন বিরক্ত হয়ে তার প্রণয়িনীকে পরিত্যাগ করে, তখন সে (প্রণয়িনী) 'পথের নারী' হিসেবে ক্রমশঃ অধঃপতিত হতে থাকে। কারণ, তার প্রথম প্রেমিক তার ভবিষ্যতের জন্য কোন দায়িত্ব নেয় নি। একজন নারীর পক্ষে প্রলুব্ধ হয়ে সতিত্ব বিসর্জন দিয়ে সম্ভবতঃ অবৈধ সন্তানের মাতা হয়ে আশ্রয়হীনা হওয়া এবং যে-কোন পথিকের শিকার হয়ে রাতের পর রাত কাটানো এবং মাতৃত্বের অযোগ্য এবং ঘৃণিত অবস্থায় থাকার চেয়ে বহুবিবাহের মাধ্যমে মুসলিম পরিবারে একই মানুষের সাথে আবদ্ধ থেকে বৈধ সন্তান কোলে নিয়ে এবং মর্যাদার সাথে বসবাস করা উত্তম এবং সুখকরই বটে।

এছাড়া আইনের দিক দিয়ে মুসলিম নারীর স্থান পাশ্চাত্য নারীদের চেয়ে বহুগুণে উত্তম। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কিছুদিন আগে বৃটিশ আইন মেয়েদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে দিয়েছে'।[৭]

তালাক

বিবাহ ইসলামী শরিয়তসিদ্ধ একটি পবিত্র বন্ধন। এর ওপর সামাজিক উন্নতি ও শান্তি নির্ভর করে বলেই এর পবিত্রতার ওপর ইসলাম এত অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। তবুও অনিবার্য কারণে কখনও কঠিন শর্তাধীনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ বা তালাকের বিধান রয়েছে। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেও এ বিধান রয়েছে এবং কোনও কোনও ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে এ বিধান একেবারেই নেই। অনিবার্য কারণবশতঃ বিচ্ছেদ ঘটতে পারে তা আমরা সমসাময়িক সামাজিক উদাহরণাদি হতেও উপলব্ধি করতে পারি। স্বামীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হলে বা বহুদিন পর্যন্ত নিরুদ্দেশ হয়ে থাকলে, পুরুষত্বহীন হয়ে পড়লে বা উভয়ের যে-কেউ বিকলাঙ্গ বা মারাত্মক ব্যধিগ্রস্ত হয়ে পড়লে, ব্যভিচারে অভ্যস্ত হয়ে পড়লে ইত্যাদি নানা কারণে তালাক বা বিচ্ছেদ ঘটতে পারে।

আরবদের মধ্যে স্বামীর তালাক দেওয়ার সীমাহীন ক্ষমতা ছিল। তাতে কোন নীতির বালাই ছিল না। মহানবী (সঃ) এ-প্রথা মেনে নিলেও তিনি একে অন্তরের সাথে ঘৃণা করতেন। তিনি মানবতার এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এর বিপুল সংস্কার সাধন করেছিলেন। তাই তাঁর বিধানে যুক্তিযুক্ত কারণে স্বামী-স্ত্রী উভয়কে তালাকের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে এবং উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদের কারণ দেখা দিলে পুনর্মিলনের জন্য চেষ্টা করার কথা রয়েছে এবং বিচ্ছেদ হওয়া সাব্যস্ত হলে তারজন্য পৃথক পৃথক তিনটি সময়ের উল্লেখ করা হয়েছে এবং তার উভয় পক্ষ ইচ্ছা করলে চেষ্টা করে আপোষ করে দাম্পত্য সম্পর্ক পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং তৃতীয় সময়ের মধ্যে তা না হলে বিচ্ছেদ কার্যকরী বলে ঘোষিত হবে। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের বিধানে স্বামীকে কেবল তালাকের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে এবং তালাক হয়ে গেলে তাদের পুনর্মিলনের কোন অবকাশ থাকে না বা কোন অবস্থাতেই আপোষের ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয় না। ইসলামী বিধান মতে স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ হয়ে গেলেও শর্তাধীনে তাদের মিলনের পথ খোলা থাকে। যদিও তেমন ঘটনা খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়।

কুরআন—হাদীস হতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, যদিও অনিবার্য কারণে ইসলামে তালাকের অনুমতি রয়েছে, পরোক্ষভাবে আল্লাহ্ ও রাসূল একে অত্যন্ত অপ্রিয় এবং ঘৃণিত কাজ বলে আখ্যায়িত করেছেন। মহানবী (সঃ) বলেছেন, "বৈধ বিষয়াদির মধ্যে আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে ঘৃণিত হলো তালাক"। কুরআনে উল্লেখ রয়েছে, "যদি তোমরা তাদের (স্ত্রীগণকে) ঘৃণা কর, তবে হতে পারে তোমরা এমন একটি জিনিসকে ঘৃণা করছো, অথচ আল্লাহ্ তার মধ্যে যথেষ্ট ভালো নিহিত রেখেছেন (৪ : ১৯)"।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদের কারণ দেখা দিলেও তা যেন সংঘটিত না হয় সেজন্য কুরআনে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, "এবং তোমরা যদি তাদের দু'জনের (স্বামী-স্ত্রী) মধ্যে বিচ্ছেদের আশংকা করো তবে তার (স্বামীর) পক্ষ থেকে একজন এবং স্ত্রীর পক্ষ থেকে একজন সালিস বা বিচারক নিযুক্ত করো এবং যদি উভয় পক্ষ আপোষ করতে চায় আল্লাহ্ উভয়ের মধ্যে মিলন সংঘটন করে দেবেন (৪ : ৩৫)"। আল্লাহ্ এবং রাসূলের (দঃ) উপরোক্ত ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতেই মুসলমানগণ তালাক দেয়ার অনুমতি অপব্যবহার করে না। বিশেষ করে এ-কাজে দেনমোহর স্বামীর ওপর একটি বিশেষ বাধাও বটে। স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিলে তাকে স্ত্রীর দেনমোহর আদায় করে দিতে হয়; স্ত্রী তালাক চাইলে স্বামী দেনমোহরের মালিক হয়ে যায়।

কুরআনের উপরোল্লেখিত আয়াতের (৪ : ৩৫) মর্ম অনুযায়ী স্বামী-স্ত্রী উভয়কে তালাকের ব্যাপারে সম পর্যায়ে রাখা হয়েছে। অর্থাৎ স্ত্রীকে তালাক চাওয়ার অধিকার দেয়া হয়েছে। ধর্মশাস্ত্রবিদ্‌দের মতে স্ত্রী স্বামীর দুর্ব্যবহারের জন্য বা খোরপোষ না পেলে তার জন্য এবং নানাবিধ যৌক্তিক কারণে তালাক দাবী করতে পারে। তবে সবসময় আপোষের কথা কুরআন-হাদীসে বলা হয়েছে। কুরআনের অন্য এক স্থানে বলা হয়েছে, "কোন স্ত্রী যদি তার স্বামীর দুর্ব্যবহার ও উপেক্ষার আশংকা করে তবে তারা আপোষ নিষ্পত্তি করতে চাইলে তাদের কোন দোষ নেই (করতে পারে) এবং আপোষ নিষ্পত্তিই উত্তম (৪ : ১২৮)"।

মহানবীর (সঃ) "সংস্কারসমূহ প্রাচ্যের আইনের এক নূতন বিধান রচনা করেছে। তিনি স্বামীর তালাক দেয়ার ক্ষমতাকে সীমিত করেছেন। তিনি নারীকে যৌক্তিক কারণে তালাকের অধিকার দিয়েছেন এবং তাঁর জীবনের শেষ পর্যায়ে তিনি এতদূর অগ্রসর হয়েছিলেন যে, সালিস বা বিচারকের মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে পুরুষকে তালাক দেয়ার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে একপ্রকার তিনি বারণ করে দিয়েছিলেন"।

পর্দা

ইসলামে অবরোধ প্রথা বা পর্দা বলতে আমরা সাধারণতঃ যা বুঝে থাকি বা যা আমরা সচরাচর আমাদের দেশে বা অন্য কোথাও দেখতে পাই—ইসলামের প্রাথমিক যুগে বা মহানবীর (সঃ) সময়ে আরবে সে রকম কিছু ছিল না বলে সঠিকভাবে বলা চলে না। মেয়েরা ঘরের বাইরে যেতে পারবে না এবং যে-কোনও কাজে তারা কোন অংশ গ্রহণ করতে পারবে না এমন কোন নির্দেশ পবিত্র কুরআন এবং হাদীসে পাওয়া যায় না। রাসূলুল্লাহ্‌র (দঃ) সময়ে মেয়েরা মসজিদে গিয়ে নামায আদায় করেছে। এমনকি তাদের কেউ কেউ মুসলিম যোদ্ধাদের সাথে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে তাদের সাহায্যও করেছে। তবুও নর-নারীর চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষার জন্য এবং বিশেষ করে তাদের চালচলনে যাতে শালীনতা বজায় থাকে সে জন্য কুরআন ও হাদীসে তাদের সতর্কতা অবলম্বন করে চলবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তখনকার আরবের নারী-পুরুষের উচ্ছৃঙ্খল এবং নীতি বিগর্হিত চালচলনের পরিপ্রেক্ষিতেই এসব নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো; মেয়েদের ঘরে আবদ্ধ করে রাখার জন্য নয় বা আপাদমস্তক ঢেকে রাখার জন্যও নয়। কুরআনের বাণীসমূহ পরিষ্কারভাবে একথাই ঘোষণা করে। কুরআনে বলা হয়েছে, "হে নবী, আপনি বিশ্বাসী (বা ঈমানদার) মুসলমানদের বলে দিন তারা যেন (নামহর্‌রম স্ত্রীলোক, যাদের সাথে তাদের বিবাহ হতে পারে এমন স্ত্রীলোকদের থেকে) তাদের দৃষ্টি নীচে ফেলে এবং তাদের গুপ্তস্থানসমূহ (ব্যভিচার হতে) রক্ষা করে, তা

তাদের জন্য (হবে) উত্তম পবিত্রতা ...... ...এবং বিশ্বাসী মুসলিম নারীদেরও বলে দিন তারা যেন (যাদের সাথে তাদের বিবাহ হতে পারে এমন নামহর্‌রম পুরুষদের থেকে)[৮] তাদের দৃষ্টি নীচের দিকে রাখে এবং তাদের গুপ্তস্থানসমূহ (ব্যভিচার হতে) রক্ষা করে। স্বভাবতঃই তাদের যা অনাবৃত থাকে (মুখমণ্ডল, হাতের তালু, পায়ের তালু) তা ব্যতীত তারা যেন তাদের সৌন্দর্য (বা গহনা) প্রদর্শন না করে এবং তাদের বক্ষস্থলের ওপর যেন তারা চাদর টেনে দেয় (২৪ঃ৩০, ৩১)"।

এ পবিত্র বাণীতে নারী-পুরুষদের শালীনতা বজায় রাখার এক উত্তম পন্থা নির্দেশ করা হয়েছে। তখনকার দিনে এবং আধুনিক সমাজেও যেসব কারণে নারী-পুরুষদের মধ্যে ব্যভিচার দেখা দিতো এবং দিয়ে থাকে সেসব কারণের মূলে রয়েছে নারী-পুরুষের নির্লজ্জ অবাধ মেলামেশা। চারিত্রিক পবিত্রতা বা নৈতিকতা রক্ষা করে চলতে না পারলে সমাজের পবিত্র বন্ধন নষ্ট হতে থাকে এবং তজ্জন্য সৃষ্টিকর্তার মানুষ সৃষ্টি করার মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে না। নারী-পুরুষের দৈহিক গঠনের বিভিন্নতার দরুন পারস্পারিক চোখের চাউনির মাধ্যমে বৈদ্যুতিক আকর্ষণ সাধিত হয়ে অবৈধ যৌন ব্যধির উদ্ভব হয়ে থাকে। তাই নিজকে রক্ষা করতে হলে এবং সমাজকে বাঁচাতে হলে, নারী-পুরুষকে চক্ষু সংযত করে চলতে হবে; নারীর আকর্ষণীয় সৌন্দর্যকে আবরণমুক্ত করলে চলবে না, তাকে শালীনতা রক্ষা করে চলতেই হবে। তাকে পরপুরুষের সান্নিধ্যে আসতে হয় বলে এ শালীনতার কথা উঠছে। সে যদি বাইরে যেতে না পারে, তবে তার শালীনতা রক্ষা করার কথা এত বিস্তৃতভাবে বলার প্রয়োজন ছিল না।

কুরআনে আরও বলা হয়েছে, "ওহে নবী, আপনি আপনার স্ত্রীদের এবং মেয়েদের এবং বিশ্বাসী মুসলমানদের স্ত্রীদের বলে দিন তারা যেন তাদের গায়ের ওপর চাদর ঢেকে দেয়; তাতে তাদের (ভদ্র মহিলা বলে) জানা যাবে এবং তাদের ওপর কোন 'ইরা' বা কষ্ট পেঁ (তারা বেইজ্জতী হতে রক্ষা পাবে) (৩৩ঃ৫৯)"। এখানেও পূর্ববর্তী বাণীর (২৪ঃ৩০—৩১) সারমর্মই প্রতিভাত হচ্ছে। নারীদের বাইরে

যাওয়ার ক্ষমতা খর্ব করা হচ্ছে না; তাদের তখনকার দিনের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ধর্ষণ বা যে-কোনও প্রকার ক্ষতির সম্ভাবনা হতে বাঁচানোই এ নির্দেশের উদ্দেশ্য ছিল। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যে যে-কোন প্রকার অবগুণ্ঠন সম্মানসূচক নিদর্শন বলে তখন পরিগণিত ছিল। এমনকি প্রাচীন আসিরীয় সভ্যতার যুগেও বিবাহিত স্ত্রীদের মধ্যে একপ্রকার অবগুণ্ঠন তাদের সামাজিক মর্যাদার নিদর্শন বলে গণ্য হতো।[৯]

কুরআনের আর এক বাণীতে বলা হয়েছে, "এবং তোমরা (হে রাসূলের বিবিগণ) তোমাদের বাড়ীতে অবস্থান করো এবং পূর্বকালের অজ্ঞতার যুগের ন্যায় তোমাদের চাকচিক্য[১০] প্রদর্শন করোনা বা আড়ম্বর সহকারে ঘোরাফেরা করোনা (৩৩ঃ৩৩)"। এ বাণীতে হযরতের (দঃ) বিবিদের বাইরে যেতে নিষেধ করা হয়েছে বলা চলে না; তাঁদের আদর্শ রমণী হিসেবে থাকতে বলা হয়েছে; জাঁকজমক করে ঘোরাফেরা না করে ঘরে রমণীসুলভ কর্তব্য সম্পাদন করে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য সার্থক করতে বলা হয়েছে। মেয়েরা প্রয়োজন হলে বাইরে যেতে পারে বলে মহানবীর হাদীসেও রয়েছে।[১১]

দ্বিতীয় কথা হলো মেয়েদের ঘোমটা[১২] বা অবগুণ্ঠন নিয়ে। তাদের নামায পড়ার সময় মুখ এবং হাত ব্যতীত সমস্ত অবয়ব ঢেকে রাখতে হয়। এ হলো নামাযের নিয়ম। আবার মহানবীর সময়েও মেয়েরা মুখ খোলা রেখে জামাতে যেতো এবং তারা মসজিদে পুরুষদের সাথে দাঁড়িয়ে জামাতে নামায আদায় করতো বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। হজ্বের সময় মেয়েদের মুখ খোলা রাখার বিধি রয়েছে। পবিত্র কাবার চারিদিকে তোয়াফ বা পরিক্রমণ করার সময় সাফা-মারওয়া দৌড়ানোর সময় এবং আরফাতে অবস্থান কালে পুরুষদের পাশাপাশি থেকে তারা আনুষ্ঠানিক ইবাদত করে থাকে, অথচ তাদের মুখ খোলাই থাকে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, "মেয়েদের শালীনতার উৎকর্ষ সাধন, তাদের বেশভূষা এবং আচরণের উন্নতি বিধান এবং অপমান বা লাঞ্ছনা থেকে তাদেরকে রক্ষা করাই ছিল খোদার বাণীসমূহের উদ্দেশ্য"।[১৩] অন্যথায় হযরতের (দঃ) পরিবারের নারীরা আদর্শ রমণী হয়ে ঘরের বাইরে গিয়ে

বিরোচিত কার্যাদি সম্পন্ন করার নজির রেখে যেতে সক্ষম হতেন না। তাঁদের চারিত্রিক শালীনতা অনস্বীকার্য। 'বিবি আয়শা (রাঃ) উষ্ট্রের যুদ্ধে তাঁর নিজ সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করেছিলেন। হযরতের (দঃ) নাতনি এবং হযরত হোসাইনের বোন জয়নাব আপন ভ্রাতুষ্পুত্রকে উমাইয়াদের দ্বারা কারবালার হত্যাকাণ্ডের সময় আশ্রয় দিয়েছিলেন। তাঁর দুর্দমনীয় সাহস ও হৃদয়ের দৃঢ়তা নির্মম ওবায়দুল্লাহ্-বিন-যিয়াদ এবং নিষ্ঠুর এয়াযিদের প্রাণেও ত্রাসের সঞ্চার করেছিল।'[১৪]

## টীকা প্রসঙ্গ ও গ্রন্থালোচনা

১। ইমাম গাজ্জালী—কিমিয়ায়ে ছা'দাত।

২। আলবুখারী—৬৭ঃ২।

৩। ঐ—৬৭ঃ৮।

৪। মোসলেম—৯ঃ৪৯।

৫। মওলানা মুহম্মদ আলী—The Religion of Islam.

৬। Annie Beasant—Beauties of Islam.

৭। ঐ ঐ

৮। 'মহর্‌রম' অর্থ যাদের সাথে 'শরিয়ত' অনুযায়ী বিবাহ নিষিদ্ধ, যেমন পিতা, ভাই, স্বামীর পিতা, আপন পুত্র, স্বামীর পুত্র, বোনের ছেলে, ভায়ের ছেলে প্রভৃতি। এরা ব্যতীত অন্য সব 'নামহর্‌রম' যাদের সঙ্গে বিবাহ হতে পারে।

৯। A. Yusuf Ali—The Holy Quran, vol. (ii), P. 1126. Note 1126: Cambridge Ancient History (iii), P. 107.

১০। M. Muhammad Ali—The Religion of Islam. P, 655 A. Yusuf Ali—The Holy Quran (৩৩ঃ৩৩)।

১১। আলবুখারী—(৪ : ১৩ ; ৬৭ : ১১৬)।

১২। মাথার ঘোমটা (veil) সামাজিক মর্যাদার চিহ্ন ছিলো ; অবরোধও সামাজিক মর্যাদার নিদর্শন বলে গণ্য হতো। এমনকি এখনও বিয়ের সময় এদেশে অত্যাধুনিক মেয়েকেও শালীনতার নিদর্শনস্বরূপ ঘোমটা দিয়ে দেয়া হয়। M. Md. Ali—The Religion of Islam, P. 657 ; S. Ameer Ali—The Spirit of Islam, Note 4, P. 250.

১৩। S. Ameer Ali—The Spirit of Islam, P. 250.

১৪। ঐ ঐ ঐ

ঊনবিংশ অধ্যায়

# মুসলিম সভ্যতা

## জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা—বিশ্বসভ্যতায় এর অবদান

ইসলাম একটি নিছক ধর্মীয় আন্দোলন ছিল না; মানব সভ্যতার বিকাশের ক্ষেত্রে তা ছিল একটি জীবন্ত শক্তি। মুসলিম সভ্যতার কাছে মধ্য যুগীয় ইউরোপ এবং আধুনিক জগৎ বহুলাংশে ঋণী।

জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় অদম্য স্পৃহাই ছিল মুসলিম সভ্যতার চাবি-কাঠি। খৃীস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ইসলামের আবির্ভাবের পর হতে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত আধুনিক উন্নত দেশসমূহের ন্যায় মুসলমানগণ জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিল। এ জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা তাদের মানসিক এবং বৈষয়িক উন্নতির দিকে এগিয়ে দিয়েছিল।

## কুরআন এবং মহানবীর জ্ঞানোদ্দীপক বাণী

মুসলমানগণ যেমন তওহিদের বা খোদার একত্বের বাণী শিরোধার্য করে নিয়েছিলেন, তেমনি পবিত্র কুরআন এবং হাদীস হতে প্রেরণালাভ করে তাঁরা জ্ঞানার্জনের প্রতিও আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

মানুষ খোদাপ্রদত্ত জ্ঞানলাভ করেই সৃষ্ট জগতের ওপর তার শ্রেষ্ঠত্ব, প্রভুত্ব এবং খোদার খেলাফৎ বা প্রতিনিধিত্ব লাভ করতে সমর্থ হয়েছে। খোদাপ্রদত্ত জ্ঞানলাভের ফলেই মানব জাতির আদি পিতা হযরত আদম (আঃ)-কে সেজদা করার জন্য ফেরেস্তাগণ খোদাকর্তৃক আদিষ্ট হয়েছিলেন। মানব জাতির প্রতি খোদার শ্রেষ্ঠ দানই হলো জ্ঞান। আল্লাহ্ হযরত আদমকে (আঃ) সৃষ্টির সমস্ত গুপ্ত রহস্য সম্পর্কে জ্ঞানদান করেছিলেন (২ঃ৩১)।

কুরআন মানুষকে লেখাপড়া, গবেষণা ইত্যাদি দ্বারা জ্ঞান আহরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন, "পড়ুন আপনার প্রতিপালকের নামে, যি ন

সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত হতে, পড়ুন (প্রচার করুন), আপনার প্রভু অতি উদার ও দানশীল যিনি (কলম ব্যবহার করতে) শিক্ষা দিয়েছেন, মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানতো না (৯৬ : ৫)"।

কুরআন মানুষকে তার বুদ্ধি-বিবেচনা পরিচালনা করে প্রাকৃতিক জগতের প্রতি লক্ষ্য করতে বলেছেন। কুরআন বৈচিত্র্যময় প্রকৃতির গুপ্ত তথ্যাদি আবিষ্কার করে তাকে মানুষের কাজে নিয়োজিত করার প্রেরণা দিয়েছেন। প্রাকৃতিক জ্ঞানের এ সাধনা সমস্ত জিনিসের আদি-কারণ বা খোদার সন্ধান লাভে তাকে সমর্থ করে। কুরআনে বর্ণিত আছে, "যারা আকাশ এবং যমীন সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে চিন্তা করে বলে ওহে আমাদের প্রভু! তুমি এ সমস্ত বৃথা সৃষ্টি করো নি (৩ : ১৯১)"। "এবং তিনি জাহাজগুলিকে তোমাদেরই আয়ত্ত করে দিয়েছেন যাতে তারা খোদার হুকুমে সমুদ্রে বিচরণ করতে পারে এবং তিনি নদীগুলিকেও তোমাদের আয়ত্ত করেছেন; এবং তিনি চন্দ্র-সূর্যকেও তোমাদের কাজে নিয়োজিত করেছেন, উভয়েই তাদের কক্ষপথে চলেছে এবং দিবারাত্রও তোমাদের জন্য (সুবিধার্থে) তিনি (অবধারিত) করেছেন এবং তোমরা যা কিছু চাও তিনি তা দিয়ে থাকেন (১৪ : ৩২—৩৩)।"

কুরআনের অনুপ্রেরণা পেয়ে মুসলমানগণ একসময়ে প্রাকৃতিক জগতের তথ্যানুসন্ধানে ব্রতী হয়েছিলেন এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের নানা শাখা-প্রশাখায় উন্নতি লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। কুরআনে জ্ঞানান্বেষণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে আরো বলা হয়েছে, "বলুন, তারা কি সমান, যারা জানে (বা জ্ঞানী) এবং যারা জানে না (বা মূর্খ) (৩৯ : ৯)"।

জ্ঞান অফুরন্ত, অসীম। অসীম খোদার বৈচিত্র্যময় সৃষ্টি সারাজীবন সাধনা করেও সম্পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায় না। যতই জ্ঞানান্বেষণ করা যায় ততই জ্ঞানের পিপাসা বাড়তে থাকে, জ্ঞান সাধনায় ইতি হয় না। তাই কুরআন বলছেন, সাধনা করো এবং "বলো, আমার প্রতিপালক, আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দাও (২০ : ১১৪)"।

জ্ঞানবিজ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রে মুসলমানগণ যে কেবল কুরআনের মর্মবাণী অনুধাবন করেছে তা নয়, মহানবীর (সঃ) প্রত্যক্ষ অমীয় বাণীসমূহও তাদের হৃদয়ে জ্ঞানান্বেষণ-স্পৃহা জাগিয়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিল। তিনি বলেছেন, 'জ্ঞানার্জন করো, যে উহা খোদার উদ্দেশ্যে অর্জন করে সে পুণ্যের কাজ করে, যে জ্ঞান সম্পর্কে কথা বলে সে খোদার প্রশংসা করে, যে তা অন্বেষণ করে সে তাঁর ইবাদত করে, যে শিক্ষাদান করে সে (যেন গরীবকে ছদ্‌কা) দান করে······জ্ঞান মরুভূমিতে আমাদের বন্ধু, নির্জনে সমাজ বন্ধুহীন অবস্থায় তাহাদের সাথী; তা আমাদের সুখে পরিচালিত করে দুরবস্থাতে মনোবল যোগায়; বন্ধুদের মধ্যে তা আমাদের ভূষণ, শত্রুদের বিরুদ্ধে ঢাল"। "বিদ্যা শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলিম নর নারীর ওপর ফরয।" "বিদ্বানের কালি শহীদের রক্তের চেয়েও পবিত্র"। "তোমরা চীনদেশে যেয়েও জ্ঞান অন্বেষণ করো"। "যে জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে গৃহ ত্যাগ করে সে খোদার পথে বিচরণ করে। যে জ্ঞানান্বেষণে বের হয় খোদা তাকে বেহেস্তের রাস্তা দেখিয়ে দেন।" "এক ঘণ্টাকাল সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করা সত্তর বছর উপাসনা করার চেয়েও উত্তম"। "বিজ্ঞান ও জ্ঞান শিক্ষায় এক ঘণ্টা মনোনিবেশ করা এক হাযার শহীদের দাফন-ক্রিয়ায় উপস্থিত থাকার চেয়ে বা হাযার রাতে দাঁড়িয়ে নামায পড়ার চেয়ে উত্তম"। "হেকমতের কথা হাকীমের (জ্ঞানের কথা জ্ঞানীর) হারাধন (অপর বর্ণনায় মুমিনের হারাধন)। সুতরাং যেখানে বা যার নিকটই পাবে সে তার অধিকারী"। অর্থাৎ যার নিকট বা যে জাতির নিকটই কোন জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা বা বিষয়বস্তু পাওয়া যাবে তা মুসলমানগণ তাদের হারাধনের ন্যায় বিনা-দ্বিধায় গ্রহণ করবে। মহানবী (সঃ) লেখাপড়ার ওপর এতই গুরুত্ব দিয়েছেন যে, তিনি এমনকি বদর যুদ্ধে লেখাপড়া জানা যুদ্ধবন্দীদের মুক্ত করে দিয়েছিলেন। তিনি সে যুদ্ধের যুদ্ধবন্দীদের মুক্তিপণ নিয়ে মুক্তি দিয়েছিলেন; কেবল যারা লেখাপড়া জানতো তাদের তিনি বিনা পণে ছেড়ে দিয়েছিলেন। মুক্তিপণের পরিবর্তে তাদের প্রত্যেককে দশজন মদিনানিবাসী মুসলিম বালক বালিকাকে কিছু সময়ের জন্য লেখাপড়া শেখাতে হয়েছিলো।

কুরআনের এবং মহানবীর শিক্ষার ফলেই এক কালে জ্ঞানের ক্ষেত্রে মুসলমানগণ এক বিশদ এবং উদারনীতি গ্রহণ করে নানা দিক থেকে জ্ঞান আহরণ করেছিলেন। তাঁদের উদ্যোগ এবং সাধনার ফলেই তাঁরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখা-প্রশাখায় উৎকর্ষ সাধন করে জগতের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে যেতে সমর্থ হয়েছিলেন।

### ইসলামের প্রাথমিক যুগের জ্ঞান সাধনা

খুলাফায়ে রাশেদীনের সময় হযরত আলী, ইবন্-আব্বাস প্রমুখ জ্ঞান সাধনায় প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তাঁরা উভয়েই কবিতা, ব্যাকরণ, ইতিহাস, ন্যায়শাস্ত্র, অঙ্কশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দিতেন। হযরত আলী (রাঃ) আধ্যাত্মিক দর্শন তত্ত্বেরও অধিকারী ছিলেন। ভারতীয় কবি দবির তাঁকে রমুযদানী খোদা বা খোদার গুপ্ত রহস্যাবলীর উদ্ঘাটক বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর লিখিত কবিতা আজও সারাবিশ্বে আরবী সাহিত্যের বিশেষ অবদান হয়ে রয়েছে। এ সময় হস্তলিপি, আবৃত্তি প্রভৃতি বিষয়েও যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়েছিল।

### উমাইয়া যুগের সাধনা

আরব সভ্যতার মূল উদ্দেশ্য ছিল জ্ঞানের সম্প্রসারণ এবং বিজ্ঞানের উন্নয়ন। উমাইয়া যুগে আরব সভ্যতার এ জয়যাত্রা সূচিত হয়েছিল। মদীনা, দামেস্ক, কুফা, বসরা এ যুগে জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। গ্রীক, পারসিক এবং সিরীয় কিছুকিছু বই, এ সময় আরবীতে অনূদিত হয়েছিল। খলীফা আব্দুল মালিক আরবী ভাষাকে রাজভাষা বলে ঘোষণা করার ফলে সমগ্র আরব সাম্রাজ্যে আরবী শিক্ষার সাড়া পড়ে গিয়েছিল। এ সময় আরবী সাহিত্য এবং ভাষা চর্চায় আরব মনীষীগণ নিজেদের সৃজনী শক্তির পরিচয় দেন। বসরার বিখ্যাত আলিম আবুল আসওয়াদ দুআলী আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্রের সূত্র নিরূপণ এবং সংস্কার সাধন করেন। খলীফা-ইবন্-আহমদ সর্বপ্রথম আরবী অভিধান রচনা করেন। হাসান বস্‌রী, আবদুল্লা-বিন-মসউদ, আশ্‌শারী, ইবন্-শিহাব আমির-ইবন্-শরাহীল প্রমুখ কুরআন-হাদীস এবং ফিকাহ (আইন)-এর চর্চা করে আরবের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেন।

ইমাম হাসান বস্‌রী বস্‌রা নগরে এক ধর্মদর্শন চর্চার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। আরবের খ্যাতনামা দার্শনিক এবং মুতাযিলা (যুক্তিবাদী) মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা ওয়াসিল-বিন-আতা তাঁরই একজন শিষ্য ছিলেন। এ ছাড়া হযরত হুসাইনের পৌত্র ইমাম জাফর সাদেকও দর্শনতত্ত্বে বুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন।

উমাইয়া খলীফাদের পৃষ্ঠপোষকতার দরুন বহু মূল্যবান গ্রীক চিকিৎসা শাস্ত্রের বই আরবী ভাষায় অনূদিত হয়েছিল এবং আরবদের মধ্যে সেগুলোর বহুল চর্চার সূত্রপাত হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাথে সাথে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান চর্চারও সূত্রপাত হয়েছিল। আবু হাসেম খালেদ বিন্‌-এয়াযীদ রসায়ন এবং চিকিৎসা শাস্ত্রের ওপর বই লিখেছিলেন। অতঃপর আরব জাতি যে জ্যোতির্বিদ্যা, ক্ষেত্রতত্ত্ব, বীজগণিত, নৌচালনা ইত্যাদি বিষয়ের উন্নতি সাধন করে পরবর্তী যুগে জগতের শ্রেষ্ঠ জাতি বলে পরিগণিত হয়েছিলেন, উমাইয়া যুগেই তার প্রাথমিক সূচনার পরিদৃষ্ট হয়।

## আব্বাসীয় যুগের কৃতিত্ব

আব্বাসীয় যুগ জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনার এক স্বর্ণ যুগ বলে ইসলামের ইতিহাসে পরিচিত। তখন খলীফাদের এবং রাজ্যের বিভিন্ন শাসনকর্তা ও আমীরদের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতার দরুন জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনায় যে অনন্য সাধারণ উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল তা অমুসলিম জগতকেও জ্ঞান-বিজ্ঞানে উদ্ভাসিত করতে সমর্থ হয়েছিল। বাগদাদ, কর্ডোভা, কায়রো প্রভৃতি শিক্ষাকেন্দ্রে ইউরোপের দিকদিগন্ত হতে আগত শিক্ষার্থীদের ভিড় জমতো। এ সময় মুসলমানদের জ্ঞানার্জন স্পৃহা এতই প্রবল হয়েছিল যে তাঁরা প্রাচীন গ্রীক, মিসরীয় এমন কি ভারতীয় জ্ঞানও আহরণ করতে দ্বিধাবোধ করেন নি।

### অনুবাদ

আব্বাসীয় খলীফা মনসুর, হারুনুর রশীদ এবং মামুনের প্রচেষ্টায় বহু গ্রীক, পারসিক, সিরীয় এবং সংস্কৃত বই আরবীতে অনূদিত এবং

টীকা ও ভাষ্য সম্বলিত হয়েছিল। মনসুর একটি স্থায়ী অনুবাদ বিভাগ গঠন করেছিলেন। হারুনুর রশীদ এ অনুবাদ বিভাগকে সম্প্রসারিত করে বায়তুল হিকমাত বা বিজ্ঞানাগার নামকরণ করেন। এ বিভাগকে মামুন আরও সম্প্রসারিত করেছিলেন। পারস্যের যুন্দি শাপুর বিদ্যালয়ের গ্রীকদর্শন ও গ্রীক চিকিৎসা শাস্ত্রে বুৎপন্ন মনীষীগণ মনসুরের রাজদরবারে স্থান লাভ করেছিলেন। হারুন-অর রশীদের সময় ফযল-বিন্-নওবকর্ত পারসিক বই এবং যুন্দি শাপুরের ইউহান্না-বিন্-মাছাওয়াই খলীফার এশিয়া মাইনর অভিযানকালে সংগৃহিত গ্রীক বইসমূহের অনুবাদ করার ভারপ্রাপ্ত হয়েছিলেন।[১]

খলীফা মামুনের সময় অনুবাদ কার্য আরও ব্যাপকভাবে পরিচালিত হয়েছিল। তিনি সাহিত্য, দর্শন, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়েই উৎসাহী ছিলেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে হুনাইন এয়াকুব-আল-কিন্দী বহু গ্রীক বই আরবীতে অনুবাদ করেছিলেন। ইব্রাহীম টলেমীর (Ptolemy) বই অনুবাদ করেন। হুনাইন-ইব্ন ইসহাক ইউক্লিডের (Euclid) আরবী অনুবাদ করেন এবং তিনি গ্রীক চিকিৎসাশাস্ত্রবিদ গেলেন হিপ্পো-ক্রেটিস, আর্কিমিডিস প্রমুখ মনীষীদের গ্রন্থসমূহেরও বহুলাংশ আরবীতে অনুবাদ করেছিলেন।

### রসায়ন

রসায়ন (Chemistry), চিকিৎসা (Medicine), উদ্ভিদ(Botany) বিদ্যা ইত্যাদিতেও এ যুগের মুসলমানদের অবদান লক্ষণীয়। রসায়ন শাস্ত্রে গবেষণা করে কুফায় আবু মুসা জাবের নূতন তথ্য আবিষ্কার করেন এবং রসায়ন শাস্ত্রের জনক বলে খ্যাতিলাভ করেন। রাসায়নিক উপায়ে ঔষধ প্রস্তুত করার উপায়ও মুসলমানগণ আবিষ্কার করেছিলেন।

### চিকিৎসা বিদ্যা

চিকিৎসা শাস্ত্রে এবং অস্ত্রচিকিৎসায়ও এ যুগে মুসলমানদের সর্বোচ্চ উন্নতি সাধিত হয়েছিলো। আধুনিক ঔষধাগারের (Dispensaries) ন্যায় মুসলমানগণ বহু প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন। তাঁরা প্রত্যেক

শহরে সরকারী ব্যয়ে 'দারুসশাফা' নামে সর্বসাধারণের জন্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। চিকিৎসাশাস্ত্রে ইব্‌ন-আব্বাস, ইব্‌ন-সীনা, ইব্‌ন-জুহর, ইব্‌ন-রুশদ, আবেদ-বিথার, ওমর-বিন-খলদুন প্রমুখ যুগান্তর সৃষ্টি করেছিলেন। আলী-ইবন্‌-আব্বাস একজন প্রসিদ্ধ অস্ত্র চিকিৎসক ছিলেন। ইব্‌ন-সীনা (আভিসিন্না) যুগশ্রেষ্ঠ ও বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন লোক ছিলেন। তিনি একাধারে দার্শনিক, অঙ্কশাস্ত্রবিদ, জ্যোতির্বিদ, কবি এবং চিকিৎসক ছিলেন। তাঁকে প্রাচ্যের এ্যারিস্টটল বলা হতো। চিকিৎসা বিদ্যার ওপর লিখিত তাঁর 'কানুন' এবং 'অশুর্যা' চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভিত্তি হিসাবে সর্বত্র সমাদৃত হতো।

আলী-ইব্‌ন-আব্বাস বার খণ্ডে চিকিৎসা শাস্ত্রের এক বই লিখেছিলেন। হিপ্পোক্রেটিস এবং গেলেনের বহু ভুল তথ্য তিনি সংশোধন করেছিলেন।

একাদশ শতাব্দীর একজন প্রসিদ্ধ অস্ত্রচিকিৎসক ছিলেন আবুল কাশেম খালেদ। তিনি ইউরোপে আবু কাশিম নামে পরিচিত। তাঁর অস্ত্রোপচার পদ্ধতিতে আধুনিক পদ্ধতির পূর্বাভাস পাওয়া যায়।

### উদ্ভিদ্‌বিদ্যা

এ যুগে উদ্ভিদ্‌বিদ্যারও বহু উন্নতি সাধিত হয়েছিল। মুসলমানগণ গ্রীকদের চেয়েও বেশী অর্থাৎ প্রায় দু' হাজার নানা রকমের অতিরিক্ত চারাগাছ সংগ্রহ করেছিলেন।

চিকিৎসা কার্যে ব্যবহার্য লতাপাতা সম্পর্কে ইব্‌নে বায়তর নামে একজন উদ্ভিদ-তত্ত্ববিদের প্রবন্ধাদি আধুনিক উদ্ভিদ-তত্ত্ববিদদের নিকট আজও অতি মূল্যবান বলে বিবেচিত। ভূতত্ত্ব ও প্রাণীতত্ত্বেও তাঁরা প্রভূত উন্নতি লাভ করেছিলেন।

### স্থাপত্য শিল্প

স্থাপত্য-শিল্পে মুসলমানদের অমর কীর্তি সর্বত্র স্থাপিত হয়েছিলো। কর্ডোভার মসজিদ বা দামেস্কের বড় মসজিদ প্রভৃতি সারাসেন স্থাপত্যের

অমর কীর্তির নিদর্শন। কর্ডোভার মসজিদের গঠনপ্রণালী বাইজানটাইনের প্রসিদ্ধ ইঞ্জিনিয়ারগণকেও এককালে হতভম্ব করে দিয়েছিল।

সুদূর পাক-ভারতে, বিশেষ করে মুঘল সম্রাটদের স্থাপত্য-শিল্পে মুসলমানদের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। মুসলমানদের নির্মিত তাজমহল, দিওয়ানী আম, দিওয়ানী খাস, মতি মসজিদ, বুলন্দ দরওয়াজা প্রভৃতি আজও জগতবাসীর বিস্ময়ের উদ্রেক করে থাকে।

জ্যোতির্বিদ্যা

আব্বাসীয় যুগে জ্যোতির্বিদ্যারও প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল। সর্বপ্রথম আরব জ্যোতির্বিদ মাশাআল্লাহ্ এবং আহমদ-বিন-মুহম্মদ নেহাওয়ান্দী খলীফা মনসুরের সমসাময়িক ছিলেন। মামূনের সময়েই জ্যোতির্বিদ সেন্দবিন আলী, ইয়াহয়া-বিন মনসুর এবং খালেদ-বিন আব্দুল মালেক প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন। আবু মাসার, আবুল হাসসান বাতানী, বানু আমযোর, আবুল ওয়াফা, ইবনে ইউনুস প্রমুখ ব্যক্তিগণও পরবর্তীকালে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। আবু মাসারের লিখিত জিসবায়ে মাসার জ্যোতির্বিজ্ঞানের উৎস বলে বিবেচিত হতো। আবুল হাসসান দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করে জ্যোতিঃশাস্ত্রের বিশেষ উন্নতি সাধন করেন। লেটিন ভাষায় অনূদিত বাতানীর জ্যোতিঃশাস্ত্রীয় তালিকাসমূহ বহু শতাব্দী ধরে ইউরোপের জ্যোতিঃশাস্ত্রের ভিত্তিরূপে গৃহীত হয়েছিল। খলীফা মামূন ৮২৯ খ্রীস্টাব্দে সামাহিয়াতে এক মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এলজাব্রার আবিষ্কারক প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ আবু জাফর, মুহম্মদ বিন মূসা, খাওয়ারিজমী এ মানমন্দিরেই গবেষণা করতেন।

আবুল ওয়াফা ত্রিকোণমিতি এবং জ্যোতিঃশাস্ত্র বিষয়ক গবেষণায় নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন এবং টলেমীর চান্দ্রিক মতবাদে ভ্রান্তি প্রদর্শন করে স্বাধীন এবং নতুন তথ্য আবিষ্কার করেছিলেন। কায়রোর ইবনে ইউনুস সময় নিরূপক দোলক (Pendulum) আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর জ্যোতিঃশাস্ত্র বিষয়ক প্রসিদ্ধ রচনা 'সিযুল-আকবারুল-হাকীমী'

পারসিক, গ্রীক, মোঙ্গল এবং চীনাদের জ্যোতিবিদ্যায় নানাভাবে গৃহীত হয়েছিল। তা টলেমীর মতবাদ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করে দিয়েছিল। স্পেনের অধিবাসী হাসান ইব্‌ন-হাইথাম কায়রোতে ইব্‌ন-ইউনূসের আবিষ্কারের ওপর গবেষণা করেন। তিনি দৃষ্টি (Vision) সম্পর্কেও নতুন তথ্য আবিষ্কার করে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

স্পেনের কর্ডোভা নগরীও তখন জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় সমগ্র ইউরোপকে আকৃষ্ট করেছিল। ইউরোপে আরবরাই সর্বপ্রথম মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১১৯০ খ্রীস্টাব্দে এ মানমন্দির সেভাইলে প্রতিষ্ঠিত হয়।

আবু রায়হান, মুহম্মদ-বিন্‌-আহম্মদ আলবেরুনীও সুলতান মাহমুদের সময়কার একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ ছিলেন। তিনি একাধারে দার্শনিক, ভূগোলশাস্ত্রবিদ, অঙ্কশাস্ত্রবিদ এবং জ্যোতির্বিদ ছিলেন। জ্যোতির্বিদ্যার ওপর তাঁর আল-কানূন-আল মাস্‌উদী নামক লিখিত বিষয়, তাঁর অঙ্ক-শাস্ত্র এবং জ্যোতিঃশাস্ত্রে তাঁর মৌলিক জ্ঞান ও গবেষণারই পরিচয় মেলে। পারস্যের প্রসিদ্ধ কবি ওমর খৈয়ামও জ্যোতির্বিদ্যা ও অঙ্কশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ছিলেন।

## ইতিহাস

ইতিহাস রচনায়ও মুসলমানদের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। প্রত্নতত্ত্ব এবং ভূগোলও তাঁদের ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আবার ঐতিহাসিকদের মধ্যে ইব্‌ন-ইসহাক, বালাযুরী, হামাদানী, তাবারী, মাস্‌উদী, উতবী ও ইবনুল আমীর ছিলেন সমধিক প্রসিদ্ধ। তাঁরা দর্শন ও অঙ্কশাস্ত্রেও পারদর্শী ছিলেন। ঐতিহাসিক হিসেবে পরবর্তী যুগে ইব্‌ন-খলদুন সমধিক কৃতিত্ব অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। মাস্‌উদীর ঐতিহাসিক রচনা এতই শক্তিশালী ছিল যে প্রাচ্যের হেরোডোটাস (প্রসিদ্ধ গ্রীক ঐতিহাসিক) বলে তিনি সর্বত্র আখ্যায়িত হতেন। তিনি বাগদাদের অধিবাসী ছিলেন। ভারত, চীন, ইন্দোচীন, মধ্য-এশিয়া প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করে তিনি বসরায় বসতি স্থাপন করেন এবং এখানে তাঁর প্রসিদ্ধ ইতিহাস-গ্রন্থ মুরুজুয-যাহাব প্রকাশ করেন। পরে তিনি কায়রোতে

গিয়ে কিত্তাবুত্-তানবিহ্, প্রভৃতি আরও বহু গ্রন্থ রচনা করেন। মুরুজুয-যাহাবে তিনি তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতার কাহিনী সাবলীল ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। ইবনুল আমীর নামে অপর এক ঐতিহাসিক এ যুগের আর এক বিশিষ্ট অবদান। তাঁর লিখিত ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'কামীল' আধুনিক যুগের যে-কোন শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক গ্রন্থের সঙ্গে তুলনীয়।

খ্রীস্টীয় চৌদ্দ শতাব্দীতে ইব্ন খলদুন নামে এক মুসলিম ঐতিহাসিক বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি ১৩৩২ খ্রীস্টাব্দে টিউনিসে জন্ম-গ্রহণ করেন। বহুদিন পর্যন্ত তিনি কায়রোতে কাযীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর লিখিত বিখ্যাত ইতিহাস-গ্রন্থ কিতাবুল-ইবার-এর মুখবন্ধ (Prolegomena) একটি অতি মূল্যবান তথ্যপূর্ণ দার্শনিক প্রবন্ধ বলে আজও সর্বত্র সমাদৃত। এতে তিনি সমাজের উৎপত্তি-বিকাশ, রাজ্যের উত্থান-পতনের কারণ, চরিত্র গঠনের ওপর আবহাওয়ার প্রভাব ইত্যাদি বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। ১৪০৬ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমান বাদশাহ্দের সময় ইতিহাস ধারা-বাহিকভাবে রচিত হয়েছিল। বিশেষ করে মোঘল সম্রাটদের সময়ে লিখিত ইতিহাস-গ্রন্থগুলি ছিল অতি উন্নতমানের। সম্রাট বাবর ও জাহাঙ্গীরের আত্মকাহিনী, ঐতিহাসিক আবুল ফজলের আকবরনামা, আইনী-আকবরী, আব্দুল কাদের বাদাউনীর মুন্তাখাবুত-তাওয়ারীখ প্রভৃতি ইতিহাস-গ্রন্থ সভ্যজগতের সম্পদ হিসেবে গৃহীত এবং রক্ষিত হয়েছে।

### ভূগোল

মুসলিম ভূগোলবেত্তাদের মধ্যে এয়াকুতের নামই সমধিক প্রসিদ্ধ। মোকাদ্দেসী ও মাসুদীও ভূগোলজ্ঞ হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইব্নে-রোস্তা নামক অপর এক ভূগোলবেত্তা তাঁর লিখিত ভূগোলে যুক্তিদ্বারা পৃথিবী গোলাকার বলে প্রমাণ করেছিলেন।

অঙ্কশাস্ত্র সম্পর্কিত ভূগোল-(Mathematical Geography) বেত্তাদের মধ্যে ইব্ন-হাওকাল মাক্রিযি, আল্-ইস্তাখ্রি, মাসুদী, আলবেরুনী, আল-কুমী, আল-ইদ্রিসী, আবুল ফেদা প্রমুখ ছিলেন প্রধান। এ রকম

ভূগোল-বিজ্ঞানকে তাঁরা 'রসমুল আরজ' বলে উল্লেখ করেছেন। আল ইদ্রিসীর লিখিত ভূগোল-গ্রন্থ 'নুকহাতুল মুস্তাক'-এ আটলান্টিক মহাসাগরীয় বহু তথ্য লিপিবদ্ধ রয়েছে। আলবেরুনী তাঁর 'জামাহির' নামক গ্রন্থে সূর্য উত্তর মেরুতে একাধারে ছয় মাস উদিত হয় না বলে উল্লেখ করে গিয়েছেন। ভৌগোলিক-জ্ঞান আরবদের জ্ঞানার্জন এবং বাণিজ্যিক সুবিধালাভের জন্য অপরিহার্য ছিল। তাঁরা দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন এবং এরই সাহায্যে নানাদিকে ছড়িয়ে পড়তে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁরা আফ্রিকা, ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, ভারতীয় উপকুল, মালয় উপদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন। এমনকি সুদূর চীন দেশে পর্যন্ত তাঁরা উপনীত হয়েছিলেন এবং আজোর্স দ্বীপপুঞ্জ এবং আমেরিকা পর্যন্ত তাঁরা আবিষ্কার করেছিলেন বলেও অনুমান করা হয়।[২] প্রায় সর্বত্রই তাঁদের বাণিজ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। অষ্টম ও নবম শতাব্দী হতে বাংলাদেশের সঙ্গেও তাঁদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁরা জাহাজযোগে চট্টগ্রাম, সিলেট প্রভৃতি স্থানের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। বাংলাদেশ মুসলিম শাসনের অধীনে আসার পর এ যোগাযোগ আরও জোরদার হয়ে পড়ে। ময়নামতিতে আব্বাসীয় সময়ের মুদ্রা পাওয়ার ফলে এর সত্যতা প্রমাণিত হয়।[৩]

স্পেনীয় আরবদের উন্নতির কালে তাঁদের প্রায় এক হাজারেরও বেশী বাণিজ্যিক জাহাজ ছিল। দানীউব নদীর উপকুলে তাঁদের কারখানা প্রতিষ্ঠিত ছিল; কনস্টান্টিনোপলের সাথে এবং আফ্রিকার উপকুল ধরে মাদাগাস্কার পর্যন্ত তাঁদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। স্পেনের মালাগা, বার্সিলোনা, কেডিজ প্রভৃতি বন্দর আমদানী-রপ্তানীর কেন্দ্র ছিল। কর্ডোভার পর্দার কাপড়, মার্সিয়ার উল, গ্রানাডার সেভাইল ও আলমিরার রেশম, টলেডোয় লৌহ ও স্বর্ণ-তৈরী জিনিস এবং সালিবাহ্‌র কাগজ পৃথিবীর সর্বত্র আদৃত হতো।

### অঙ্ক শাস্ত্র

ভূগোলবেত্তাদের মধ্যে অনেকেই আবার অঙ্ক শাস্ত্রে নৈপুণ্য অর্জন করেছিলেন। আমরা তাঁদের কথা পূর্বেই কিছু আলোচনা করেছি।

মুসলমানেরাই এ্যালজাব্রার উন্নতি সাধন করে একে বহুবিধ উন্নয়নমূলক কাজে লাগিয়েছিলেন। মামুনের সময়েই তাঁরা সমীকরণ আবিষ্কার করেন এবং পরে বর্গক্ষেত্র সম্বন্ধীয় সমীকরণ (Quadritic equation) ও দ্বিপদ উপপাদ্য (Biomenal theorem) প্রভৃতির বিকাশ সাধন করেন। তাঁরা গোলক ত্রিকোণমিতি (Global) আবিষ্কার করেছিলেন এবং তাঁরাই সর্বপ্রথম জ্যামিতিতে এ্যালজাব্রার প্রয়োগ করেন।

## দর্শন শাস্ত্র

মানব সভ্যতায় দর্শন শাস্ত্রেও মুসলমানদের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। মুসলিম দার্শনিকদের মধ্যে আল-কিন্দী, আল-ফারাবী, ইব্‌ন-বাষা, ইব্‌ন-তোফায়েল এবং ইব্‌ন-রুশদই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আল-কিন্দী, বাগদাদ এবং বসরাতে অধ্যয়ন করেন এবং খলীফা মামুন এবং মুতাসীমের সময় বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করেন। তিনি গ্রীক, পার্সী, সংস্কৃত প্রভৃতি নানা ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং মামুনের সময় বহু গ্রীক গ্রন্থও আরবীতে অনুবাদ করেছিলেন। গ্রীক দার্শনিক এরিস্টোটলের লিখিত বিষয়াদিও এ অনুবাদ কার্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ ছাড়া তিনি দর্শন, অঙ্ক, জ্যোতির্বিদ্যা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান, সংগীত ইত্যাদির ওপরও তিনি যথেষ্ট লেখা রেখে গেছেন।

আবু-নসর আল ফারাবী, গ্রীক দার্শনিক এরিস্টোটলের একজন চুলচেরা সমালোচক বলে পরিচিত ছিলেন। তিনি আলেপ্পোর সয়েফুদ্দৌলা আলী-বিন-হামাদানের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। তাঁর লিখিত 'ইহ্‌সানুল-উলুম' (Encyclopaedia of Science) গ্রন্থে তিনি সমস্ত বিজ্ঞানের ওপর আলোচনা করেছেন। তা পরে ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। এরিস্টোটলের অর্গেন (Organon)-এর ওপর সমালোচনা তাঁর এক অমর কীর্তি। এ সমালোচনামূলক গ্রন্থ রজার বেকন (Roger Bacon) প্রমুখ ইউরোপীয় পণ্ডিত গভীরভাবে অনুধাবন করেছিলেন।

'প্লেটো এবং এরিস্টোটলের দর্শনের প্রবণতা' নামক তাঁর লিখিত প্রবন্ধ, নীতিশাস্ত্র বিষয়ক তাঁর 'আস-সীরাতুল-কযালা', রাষ্ট্রবিজ্ঞানের

ওপর লিখিত 'আস-সিয়া-সাতুল মেদিনিয়্যা' এবং তাঁর লিখিত বিশদ গ্রন্থ 'মাবাদিউল মউজুফাত' প্রভৃতি তাঁর বহুমুখী প্রতিভারই পরিচায়ক সন্দেহ নেই।

দর্শন এবং চিকিৎসা শাস্ত্র ছাড়াও ফারাবী সংগীত সাধনা করতেন। সংগীত বিদ্যার ওপর তিনি বহুকিছু লিখে গেছেন।

চিকিৎসা শাস্ত্রে ইব্‌নে-সীনার অবদান সম্পর্কে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। দর্শনতত্ত্বেও তাঁর অবদান অতুলনীয়। তিনি বৈজ্ঞানিক নিয়মে এরিস্টোটলের দর্শন-তত্ত্বকে সুসংবদ্ধ করেন এবং 'মানুষ এবং আল্লার মধ্যে শূন্যতা' পরিপূরণ করেন। আরব দার্শনিকগণ প্রায় সকলেই বিজ্ঞানের দার্শনিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিকের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁরা মহাবিশ্বের একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করে ধর্মীয় স্পৃহার তৃপ্তি সাধন করেছেন। তাঁর মতে মানবাত্মার মধ্যে এবং আদি প্রধান কারণের (খোদার) মধ্যে অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে এবং এ ধারণা মওলানা জালালুদ্দিন রুমীর লেখার মধ্যেও প্রতিফলিত হয়েছিল।

দার্শনিক ইব্‌ন-সীনা অধিবিদ্যা (Metaphysics) সম্পর্কে দশটি প্রবন্ধ লিখেছেন। ষষ্ঠ ও সপ্তম প্রবন্ধে তিনি প্রমাণ করেছেন যে, জগতের আদিকারণ এক এবং সর্বক্ষমতার অধিকারী (absolute); আদিকারণের অস্তিত্ব হেতুই তা বিরাজ করে। অষ্টম ও নবম প্রবন্ধে তিনি মহাবিশ্বের একত্ব এবং মানবীয় আত্মার সঙ্গে আদিকারণ এবং প্রথম সৃষ্ট সক্রিয় বুদ্ধির (intellect) সম্পর্কের কথা প্রমাণ করেছেন। সর্বশেষে তিনি পরকালের জীবন সম্পর্কে তাঁর মতবাদ ব্যক্ত করেছেন। তিনি আত্মার অমরত্ব এবং নবুয়তের আবশ্যকতার কথাও যুক্তি দ্বারা প্রকাশ করেছেন।

ইব্‌ন-বাজা মুসলিম স্পেনের একজন খ্যাতনামা দার্শনিক। তিনি একাধারে চিকিৎসা শাস্ত্র, অঙ্ক শাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা এবং সংগীত শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। ইব্‌ন-তোফায়েল আর একজন স্পেনীয় মুসলিম দার্শনিক। ইব্‌ন-বাজার ন্যায় তাঁর বহুমুখী প্রতিভা ছিল।

ইব্‌ন-রুশদ ছিলেন কর্ডোভার অধিবাসী। তিনি আরবজাহানের একজন অনন্য সাধারণ দার্শনিক। তিনি গ্রীক দার্শনিক এরিস্টোটলের একজন দক্ষ সমালোচক ছিলেন। চিকিৎসা ও অঙ্ক শাস্ত্রেও তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। আল্‌কিন্দী, আল্‌ফারাবী প্রমুখ দার্শনিক ধর্মের শিক্ষা এবং দর্শন-তত্ত্বের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে প্রয়াসী হয়েছেন। ইব্‌ন-রুশদ তা প্রমাণ করে বুঝতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে ধর্ম সত্য; কারণ তা ঐশী বাণীরই অবদান; দর্শনও সত্য; কারণ তা মানবীয় বুদ্ধির দ্বারাই প্রাপ্ত। তাই উভয়ের মধ্যে বিরোধ থাকতে পারে না। তাঁর মতে কামালিয়াত (Perfection) অর্জন করার জন্য অর্থাৎ বিশ্বজনীন সক্রিয় বুদ্ধির (Active Universal Intellect) সাথে সম্পূর্ণভাবে মিলিত হয়ে যাওয়ার জন্য মানুষকে সর্বোত্তম প্রচেষ্টা করতে হবে, অর্থাৎ কামালিয়াত অর্জন করতে হলে আত্মার নিকৃষ্টতর বৃত্তিগুলি (Inferior faculties) ত্যাগ করে অধ্যয়ন এবং অনুধ্যান করতে হবে। তিনি নবুয়তে বিশ্বাসী। ধর্ম এবং দর্শনের প্রচারিত চিরন্তন সত্য জনসমাজে প্রচারিত হওয়ার জন্য ওহীর প্রয়োজন ছিল বলে তিনি মনে করেন। ধর্ম সত্যকেই জনপ্রিয় করে প্রচার করে। কেবল দর্শনই বিশদ ব্যাখ্যা দ্বারা ধর্মীয় নীতি ব্যাখ্যা করতে পারে। নির্বোধরা কেবল এর বাহ্যিক অর্থই গ্রহণ করতে থাকে।

অদৃষ্টবাদ সম্পর্কে ইব্‌ন-রুশদ বলেন, মানুষ তার কাজের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী নয়। আমাদের কাজ আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার ওপর আংশিকভাবে নির্ভর করে এবং আংশিকভাবে বাহ্যিক কারণের ওপরও নির্ভর করে। আমরা স্বাধীনভাবে কোন একরকম ইচ্ছা বা কাজ করতে পারি। তবে আমাদের ইচ্ছা সবসময় বাইরের কারণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। এ সব কারণ সাধারণ প্রাকৃতিক বিধান হতে উদ্ভূত। একমাত্র খোদাই এদের বিষয় জানেন। একে ধর্মীয় ভাষায় 'কাযা' এবং কদর বলা হয়ে থাকে।

ইব্‌ন-রুশদ ধর্ম এবং দর্শনের মধ্যে সমঝোতার কথা বলেছেন এবং তাঁর এক অন্তরঙ্গ ধর্মপ্রাণ বন্ধু আব্দুল কবীর বলেন, তিনি ধর্ম এবং দর্শনের মধ্যে ঐক্য সাধন করতে সর্বোত্তম চেষ্টা করে গেছেন।

মুতাযিলা এবং ইখ্ওয়ানুস সাফা নামে দু'টি স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ও দার্শনিক আলোচনাও আব্বাসীয় যুগের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মুতাযিলা সম্প্রদায়ের নায়ক ছিলেন প্রসিদ্ধ হাসান আল-বস্‌রীর ছাত্র ওয়াসীল-বিন-আতা। কুরআন, পরকাল, পরকালে সৃষ্টিকর্তার দর্শন লাভ, মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা এবং কার্য ইত্যাদি বিষয়ে এ সম্প্রদায়ের লোকগণ স্বাধীন মতামত প্রকাশ করতেন। খলীফা মামূনের সময় তাঁদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং মুতাওয়াক্কিলের সময়েই তাদের কার্যের পূর্ণ ব্যাঘাত ঘটে।

ইখ্‌ওয়ানুস্‌-সাফা সম্প্রদায় গ্রীক দার্শনিকদের দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক তথ্য এবং সূফী ও মুতাযিলা মতবাদের সারমর্ম গ্রহণ করে এক নতুন বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। শিক্ষিত সমাজে তাঁদের ধর্মীয় ও বৈজ্ঞানিক ভাবধারার পরিবর্তন সাধন করাই এ সম্প্রদায়ের প্রধান উদ্দেশ্য।[8] তাঁদের ধর্মীয় ভাবধারাতে ফারাবী এবং ইব্‌ন-সীনার ধর্মীয় ভাবধারারই প্রতিধ্বনি হতো।

## সাহিত্য

আব্বাসীয় যুগে আরবী সাহিত্যের বিপুল উন্নতি সাধিত হয়েছিল। আরবী কাব্য শাখার আবূ-নওয়াস, 'উতবী, মুতানব্বী, 'আবুল-আলা মা'র্‌রী, আবুল-'আতাহিয়া এবং আবূ-তাম্মামের নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। সাহিত্যের গদ্যশাখাও বদীউয্‌-যমান, হামাদানী ও হারীরীর দানে বিশেষ পুষ্ট হয়ে উঠেছিল।

আরবী সাহিত্যের প্রভাবে এযুগে পার্সী সাহিত্যেরও বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়েছিল। এ যুগের বিখ্যাত 'কবি আব্বাস' দাকীকী, ফেরদৌসী, উমর খৈয়াম এবং উন্‌সুরী নিজ নিজ রচনা দ্বারা পার্সী ভাষার গৌরব বর্ধন করেছিলেন।

আব্বাসীয় খিলাফতের সময়েই মহানবীর অমীয়বাণীসমূহ সংগৃহীত হয়ে হাদীস আকারে লিপিবদ্ধ হয়। এ সকল হাদীস সঙ্কলনের মধ্যে বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, ইব্‌ন-মাজা ও তিরমিযীর নাম উল্লেখযোগ্য।

এ ছাড়া এ সময়েই হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বালী নামে চারিটি মযহাবের সৃষ্টি হয়। এসব মযহাবের ধর্মীয় নেতাগণ নিজ নিজ অনুসারীদের জন্য ফিকাহ বা সমাজ সংহিতা রচনা করেন এবং অদ্যাবধি সেগুলো মুসলিম জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবন-যাপন নিয়ন্ত্রণ করছে।

## টীকা প্রসঙ্গ ও গ্রন্থালোচনা

১। O'leary—Arabic Thought.

২। S. Ameer Ali—The Spirit of Islam ; Arnold—Legaey of Islam.

৩। আল-ইদ্রিসীর ভৌগোলিক বৃত্তান্ত হতে আরবদের আমেরিকা আবিষ্কারের কথা জানা যায়। ডঃ হামিদুল্লাহ্ (Director, Paris Mosque) তাঁর প্যারিস হতে লিখিত "মুসলিম নাবিকগণ কলম্বাসের পূর্বে আমেরিকা আবিষ্কার করেছিলেন" নামক প্রবন্ধে এ তথ্য প্রকাশ করেন।

পশ্চিম জার্মানীর বন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ডঃ পি. ই. কালে (Dr. Paul Ernst Kahle) তার 'পিরীরায়ীস' নামক এক মুসলিম ভৌগোলিক নাবিকের ওপর লিখিত প্রবন্ধে বলেছেন যে, পিরীরায়ীস ১৫১৭ সালে ভূমধ্য সাগরীয় এলাকার এক বিশদ মানচিত্র অঙ্কিত করে তুর্কীর সুলতান সুলায়মানকে উপহার দিয়েছিলেন। ১৫২১ সালে তিনি ভূমধ্য সাগর, লোহিত সাগর, ভারত মহাসাগর, প্রশান্ত মহাসাগর এবং আদ্রিয়াতিক সাগর প্রভৃতির বিশদ বিবরণ সহ এক বই রচনা করেন। এতে বহু মানচিত্র এবং নৌ-চালনার বিভিন্ন অভিজ্ঞতার কথাও সন্নিবেশিত ছিল। সুলতান সুলায়মানের সময় মিসরের পাশা একবার ভূমধ্য সাগরে জাহাজডুবির বিপদের সম্মুখীন হলে পিরীরায়ীস তখন তাঁর বই দেখে নৌ-চালকদের পথনির্দেশ দিয়েছিলেন।

ফলে তাঁর বই-এর জনপ্রিয়তা বেড়ে যায় এবং এর দ্বিতীয় সংস্করণে ভূমধ্য সাগরীয় এবং আদ্রিয়াতিক সাগরীয় বহু দ্বীপের বৃত্তান্ত সম্বলিত প্রায় তিনশত মানচিত্র তিনি এর অন্তর্ভুক্ত করেন।

পিরীরায়ীসের ভূগোলে কলম্বাসের রচিত মানচিত্রের কথা উল্লেখ রয়েছে। কলম্বাসের মানচিত্রের ত্রুটিপূর্ণ বিবরণের কথা তিনি সনাক্ত করে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন।

৩। Dr. A. H. Dani—Early Muslim Contact with Bengal (Proceedings of History Conference held in Karachi in 1951); Syed Sulaiman Nadir—Navigation of the Arabs.

৪। Macdonald—Development of Muslim Theology.

বিংশ অধ্যায়

# সূফী মতবাদ

## সূফী মতবাদের তাৎপর্য

আমরা মুসলিম দর্শন সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করেছি। সূফী মতবাদ ইসলামী দর্শন তত্ত্বেরই একটি অংশ-বিশেষ বলা যেতে পারে। ইসলামের আবির্ভাবের সূচনাতেই তা পরিলক্ষিত হয়। দুনিয়ায় ভোগ-বিলাস ত্যাগ করে গভীর ধ্যান ও উপাসনা দ্বারা খোদার সান্নিধ্যলাভ করার প্রবণতা মহানবী, সাহাবী কেরাম এবং তাঁদের বহু অনুসারীদের মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়। কুরআন এবং হাদীসই এ ধরনের মনোবৃত্তির প্রধান এবং একক কারণ। কুরআনে বলা হয়েছে, "(পৃথিবীর) সব কিছুই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে একমাত্র আপনার মহিমান্বিত ও মহাদয়ালু প্রতিপালক ব্যতীত (২৪ঃ৮৮)।" "আমি তার (মানুষের) ঘাড়ের শিরার চেয়েও তার অধিকতর নিকটে থাকি (৫ঃ১৬)।" "আল্লাহ্ আকাশ এবং যমীনের নূর (আলো) (২৪ঃ৩৫)।" "তোমরা যে দিকেই তাকাও সে দিকেই আল্লাহ্ (আছেন) (১১ঃ১০৯)।" "যখন আপনাকে আমার সম্পর্কে আমার কোন বান্দা জিজ্ঞেস করে, আমি নিকটেই (অবস্থান করি)। যে আমাকে ডাকে তার ডাকে আমি সাড়া দিয়ে থাকি (২ঃ১৮৬)।" "তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনিই পরিদৃষ্ট এবং তিনিই অদৃশ্য ইত্যাদি (৫৭ঃ৩)।"

মহানবী (সঃ) বলেছেন, "আল্লাহ্ বলেন, আমার যমীন এবং আমার আসমান আমাকে ধারণ করতে পারে না, করতে পারে একমাত্র বিশ্বাসীর প্রাণ," "আমি ছিলাম এক গুপ্ত সম্পদ এবং আমি ইচ্ছা করেছিলাম পরিচিত হওয়ার জন্যে, পরিচিত হওয়ার জন্যেই আমি সৃষ্ট জগত সৃষ্টি করেছি।"

যে-কেহ আমার দিকে এক বিঘৎ অগ্রসর হয় আমি তার দিকে একহাত অগ্রসর হই। যে আমার দিকে একহাত অগ্রসর হয় আমি তার দিকে একবাহু অগ্রসর হই। যে আমার দিকে আস্তে আসে আমি তার দিকে সত্বর যাই, ইত্যাদি।

আল্লাহ্ এবং রাসূলের এসব বাণীর পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামের প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের মধ্যে সাধু জীবন-যাপন করার প্রেরণা জেগেছিল। সকল প্রকার সাধনা দ্বারা হৃদয়ের পবিত্রতা (সাফ') রক্ষা করে তাঁরা খোদার দিদার বা অনুগ্রহ লাভের জন্য প্রয়াসী ছিলেন। কথিত আছে যে, তাঁদের বা তাঁদের অনুসারীদের মধ্যে কেউ কেউ পবিত্রতার প্রতীক হিসেবে অনাড়ম্বর মোটা উলের (সূদ) কাপড় পরিহিত থেকে আল্লাহ্‌র ধ্যানে আত্মনিয়োগ করতেন। মহানবী (সঃ) সাহাবাকেরাম এবং তাঁদের বহু অনুসারী রাত্রের অধিকাংশ সময় জাগ্রত থেকে আল্লাহ্‌র ইবাদতে রত থাকতেন। ইবাদতের মাধ্যমে তাঁদের হৃদয় প্রসারিত হতো এবং দিব্যজ্ঞান (intution) দ্বারা তাঁরা খোদার জ্যোতিঃর অনুভূতি লাভে সমর্থ হতেন। তাঁদের প্রাথমিক পর্যায়ের সূফী বলা যেতে পারে, যদিও তাঁদের সূফী নামে আখ্যায়িত করা হয়নি। কারণ সূফী শব্দের মর্মার্থ অনুযায়ী (সাফা-পবিত্রতা, পবিত্রতার প্রতীক হলো সূফী বা উল) এবং এর বর্তমান কালের প্রচলিত অর্থে তাঁরা ছিলেন পরহেজগার বা সূফী; তাঁরা সর্বক্ষণ খোদার চিন্তা এবং আরাধনা দ্বারা হৃদয়ের পবিত্রতা অক্ষুণ্ন রাখতে সচেষ্ট থাকতেন।

## সূফী মতবাদের ঐতিহাসিক পটভূমি

কারও কারও মতে (জামী প্রমুখের) কূফার আবুল হাসীম (মৃঃ হিঃ ১৬২) সর্ব প্রথম সূফী। তিনি মহানবীর (সঃ) সরল অনাড়ম্বর জীবনের অনুসারী ছিলেন এবং ইহজীবনের অস্থায়িত্ব এবং বিচারের দিনের চিন্তা তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। আবার কেউ কেউ মনে করে থাকেন যে এ নামটি জাবের-ইব্‌ন-হায়্যানকে (মৃঃ ১৬৪ হিঃ) সর্বপ্রথম দেয়া হয়েছিল। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, হিজরীর দ্বিতীয় শতকের

শেষের দিকে এ নামটির অধিক প্রচলন হয়। তখন ইহকাল এবং পরকাল সম্পর্কে কুরআনের বাণী কতিপয় খোদাপ্রেমিক লোককে আভিভূত করেছিল। তাঁরা ইবাদত-বন্দেগী (জুহদ) এবং পরহেজগারীতে (তাকওয়া) অধিক সময় অতিবাহিত করতেন। তাঁদের মধ্যে ইব্রাহীম-বিন-আদহাম (মৃঃ ১৬২ হিঃ), রাবেয়া আল্-বস্রী (মৃঃ ১৮৫ হিঃ), দাউদ-আত্তারী (মৃঃ ১৬৫ হিঃ), ফুদায়েল-বিন্-ইয়ায (মৃঃ ১৮৮ হিঃ), মারুফ-আল-কর্খি (মৃঃ ২০০ হিঃ) এবং হারিস- আল-মুসাহেবী (মৃঃ ২৪২ হিঃ) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

উপরে উল্লেখিত সাধক পুরুষদের কথা এবং জীবন বৃত্তান্ত অবলম্বন করে পরে তাপস জীবনের উপাসনা-পদ্ধতি রচিত হতে থাকে। হিজ্রীর তৃতীয় শতকের শেষের দিকে এ জাতীয় নিয়মতান্ত্রিক মতবাদ পরিদৃষ্ট হয়। যুন্নুন-আল-মিস্রীকে (মৃঃ ২৪৫ হিঃ) সূফী মতবাদের সর্বপ্রথম উদ্যোক্তা বলা হয়ে থাকে। 'তাওহীদকেই' (আল্লাহ্র সাথে রূহ্ বা আত্মার শেষ মিলন) তিনি সূফী মতবাদের নীতি নির্ধারণ করেন। হাল (ecstasy বা মোহাবিষ্ট অবস্থা) এবং 'মাকামা' (stage) ইত্যাদি আরও কয়েকটি নিয়ম প্রবর্তন করেন।

জুনায়েদ বাগদাদী (মৃঃ ২৯৭ হিঃ) যুন্নুন-আল-মিসরীর শিক্ষাকে সুসংবদ্ধ করেন এবং জুনায়েদের শিষ্য আস্-শিবলী (মৃঃ ৩৩৫ হিঃ) খোরাসানী পরে তাকে আরও সম্প্রসারিত করেন। এ সমস্ত সূফীদের শিক্ষা খোদাতত্ত্ববাদেই (Theism) সীমিত ছিল, তা সর্বেশ্বরবাদে (Pantheism) রূপায়িত হয়নি।

সূফীমতবাদ কালক্রমে সর্বেশ্বরবাদে (ফানা-ফিল্লাহ্) রূপায়িত হয়েছিল। বায়াযীদ-আল্-বিশতামী এবং মানসূর-আল-হাল্লায (মৃঃ ৩৯৮ হিঃ) প্রমুখ সর্বেশ্বরবাদ পন্থী ছিলেন। বায়াযীদের মতে খোদা এক অতল সমুদ্রের মতো; যারা তাদের সত্তালাভে সমর্থ হয় তারা খোদাতে বিলীন (ফানা) হয়ে যায়। মানসূর হাল্লাযের মতে মানুষ প্রধানতঃ স্বর্গীয় উপাদানে সৃষ্ট এবং খোদারই প্রতিমূর্তি বিশেষ। তিনি 'আনাল হক্' (আমিই সত্য) বলে নিজকে খোদার সঙ্গে সনাক্ত করেছিলেন

এবং তাই তাঁকে শরিয়তের নির্দেশক্রমে কতল করা হয়েছিল। সূফী লেখকগণ তাঁকে শহীদ বলে গণ্য করেছেন; কারণ তিনি মানবাত্মার সাথে পরমাত্মার বা খোদার মিলনের মহা গুপ্ততত্ত্ব প্রচার করেই মৃত্যু-বরণ করেছিলেন।

সূফীমতবাদ এবং ইসলামী শরিয়তের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। সূফীদের বিশেষ করে সর্বেশ্বরবাদীদের মতে খোদা ব্যতীত আর কিছুরই অস্তিত্ব নেই; আত্মা খোদারই অংশ বিশেষ, তাঁরা বলেন, 'যে নিজকে জানে সে তার প্রভুকে জানতে পারে; বাহ্যিক দুনিয়া কিছুই নয়, এর সব মিথ্যা, এর কোন সত্যিকার অস্তিত্ব নেই; মানুষ এবং খোদার মধ্যে যে সম্পর্ক তা ভালবাসারই সম্পর্ক। খোদা তাঁর ভালবাসার দরুনই জগৎ সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষ তাঁরই প্রতিমূর্তি। তাই মানবাত্মাই হলো খোদার ভালবাসার প্রতীক। খোদার সাথে মানবাত্মার মিলনই হবে সূফীদের কাম্য; স্বর্গে যাওয়া বা নরক হতে পরিত্রাণ লাভ করা তাঁদের কাম্য নয়। তাঁরা মনে করেন, খোদার প্রকৃত জ্ঞানলাভ দিব্যজ্ঞান দ্বারা সম্ভব, যুক্তিদ্বারা নয়; মোহাবিষ্ট (Mystic) অবস্থাতেই খোদার অনুভূতি জেগে থাকে এবং কেবল 'জিকির' দ্বারাই এ অবস্থার সৃষ্টি হয়ে থাকে।

সূফীমতবাদ আবু-নসর-আস্-সাররাজ (মৃঃ ৩৭৮ হিঃ) তাঁর লিখিত 'কিতাবুল লুমা'তে এবং তাঁর পরে আল্ কুশাইরী তাঁর রিছালাতে লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

রক্ষণশীল মুসলমানগণ এ ধরনের কাল্পনিক (Speculative) সূফীমত-বাদের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তা মুসলিম সমাজে প্রসার লাভ করতে থাকে। ইমাম গায্যালীর আবির্ভাবের (মৃঃ ৫০৫ হিঃ) ফলে সূফীমতবাদ পরিবর্তিত হয়ে মুসলিম সমাজে স্থান লাভ করতে থাকে।

ইমাম গায্যালীর প্রায় সমসাময়িক এবং কিছুকাল পরের সূফীদের মধ্যে আব্দুল কাদের জিলানী (মৃঃ ১১৬৬ খৃীঃ) ফরীদুদ্দীন আত্তার (মৃঃ ১২২৯ খৃীঃ), মুহি উদ্দীন ইবনুল আরবী (মৃঃ ৬৩৮ হিঃ), জালালুদ্দীন

রুমী (মৃঃ ৬৭২ হিঃ), খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তী (মৃঃ ১২৬৫ খ্রীঃ), নিজাম উদ্দীন আউলিয়া (মৃঃ ১৩২৫ খ্রীঃ) প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

সুফীমতবাদকে ইসলামের শৃংখলার মধ্যে এনেই সার্বিক উন্নতির কাজে নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে সুফীসঙ্গ বা সিলসিলাহ্‌র উৎপত্তি হয়। ইসলামী শরিয়তের বিধানসমূহ রক্ষা করতে এবং ঈমান পোক্ত করতে হলে এলমে 'তাসাওফ্‌' বা মা'রেফতেরও প্রয়োজন। খোদার নৈকট্য লাভ করতে হলে শরিয়ত রক্ষা করে বিশিষ্ট সময়ে তাঁর ধ্যানও করতে হবে। ধ্যান দ্বারা মানব মনে তাঁর ভালবাসা বা মহব্বতের অনুভূতি জাগবে এবং তাঁর ওপর বিশ্বাস পূর্ণ হবে। এ জাতীয় বহু সুফী সিলসিলাহ, উপসিলাহ্‌র উদ্ভব হয়েছিল। তবে এদের মধ্যে চিশতিয়া, সুহরাওয়ার্দীয়া, নকস্‌-বন্দীয়া এবং কাদেরিয়া—এ চার প্রকার সিলসিলাহ্‌ বা তরিকা আমাদের নিকট বেশী পরিচিত এবং প্রধান।

## চিশতিয়া, সুহ্‌রাওয়ার্দীয়া, নকস্‌বন্দীয়া ও কাদেরিয়া সিলসিলাহ্‌

এ চার প্রকার সিলসিলাহ্‌র মধ্যে চিশতিয়া তরিকা দিল্লীর সুলতানী আমলে বিশেষ শক্তিশালী হয়ে পড়েছিল এবং উত্তর, দক্ষিণ এবং পূর্ব-ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারক্ষেত্রে এর প্রচুর অবদান রয়েছে। এ তরিকার বহু সাধক 'সামা'র (খোদা-প্রেমের গান-বাদ্য) এর অনুরাগী ছিলেন। সুহ্‌রাওয়ার্দীয়াপন্থিগণ শরিয়তের দিক দিয়ে রক্ষণশীল ছিলেন এবং তাঁদের প্রচেষ্টায় গুজরাট এবং পাকিস্তানে ইসলাম প্রসার লাভ করেছিল। নকস্‌বন্দীয়া তরিকাপন্থিগণ বেশী রক্ষণশীল ছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে তাঁদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেয়েছিল। কাদেরিয়াপন্থিগণও রক্ষণশীল সুফীমতবাদের লোক ছিলেন। এ তরিকার অনুসারী পৃথিবীর সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়।

শেখ বা পীর এসব সুফীদের প্রধান ছিলেন। মুরিদ বা শিষ্য পীরের আদেশ পালন করে শরিয়ত ও মারেফতের মধ্যে সঙ্গতি রক্ষা করে চলতে সক্ষম হতো বলে পীরের প্রয়োজন ছিল। পীর তার উত্তরাধিকারী পীর বা শেখ মনোনীত করে যেতেন।

ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে খাজা মইনুদ্দীন চিশ্‌তি (রাঃ)-র জনপ্রিয়তা সুবিদিত। তিনি চিস্তানের অধিবাসী ছিলেন। মুসলিম জাহানের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করে অবশেষে তিনি আজমিরে তাঁর কার্য-কেন্দ্র মনোনীত করেন। তিনি তাঁর চিশতিয়া তরিকাকে সুসংবদ্ধ করে জনসমাজে সমাদৃত করতে সক্ষম হন। তিনি প্রায় ৯৭ বৎসর বয়সে (মৃঃ ১২৩৫ খ্রীঃ) মৃত্যুবরণ করেন। তিনি খাজা গরীব নেওয়াজ নামেই পরিচিত। শেখ আঁখি সিরাজী, শেখ আলাউল হক প্রমুখ বাংলার সূফী সাধক তাঁরই অনুগামী ছিলেন।

খাজা মইনুদ্দীন চিশ্‌তির (রাঃ) পর দিল্লীর শেখ নিজাম উদ্দীন আউলিয়া উত্তর ভারতের একজন প্রসিদ্ধ সাধক ছিলেন। ১২৩৮ খ্রীস্টাব্দে বাদাওনে তাঁর জন্ম হয় এবং তিনি ছিলেন বাবা ফরীদের শিষ্য। তিনি দিল্লীর অদূরে গেয়াসপুরে নিজ স্থায়ী বাসস্থান তৈরী করেন এবং সবসময় রাজদরবার হতে দূরে থাকতে ভালবাসতেন। তাঁর প্রচেষ্টায় গুজরাট, দাক্ষিণাত্য এবং বাংলায় ইসলাম প্রচারিত হয়। ১৩২৫ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। দিল্লীর শেখ নাসিরুদ্দীন মাহমুদ বৈরাগী তাঁর শিষ্য ছিলেন।

সুহরাওয়ার্দীয়া তরিকার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শেখ বাহাউদ্দীন জাকারিয়া মুলতানী। তিনি ১১৮২ খ্রীস্টাব্দে মুলতানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বুখারী এবং বাগদাদে লেখাপড়া করেন এবং শেখ শিহাবুদ্দীন সোহরা-ওয়ার্দী নামক সাধকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। অর্থ বা রাজনীতির প্রতি তাঁর তেমন তাচ্ছিল্যবোধ ছিল না। তিনি ১২৬৩ খ্রীস্টাব্দে মুলতানে দেহত্যাগ করেন। সৈয়দ জালালুদ্দীন বুখারী এ তরিকার একজন প্রসিদ্ধ সাধক ছিলেন। তাঁকে 'জয়নুল উলুম' বলা হতো। এ তরিকা-পন্থীদের প্রচেষ্টার ফলে সিন্ধু দেশে ইসলাম প্রসারলাভ করেছিল।

এ তরিকার অনুগামী শেখ জালালুদ্দীন তেব্রেজী সুলতান ইলতুতমিসের সময় বাংলায় এসেছিলেন এবং ইসলাম প্রচার করেছিলেন।

নকস্‌বন্দিয়া তরিকার উৎপত্তি হয় তুরানে। তা একটি রক্ষণশীল সিলসিলাহ্‌। ভারতীয় উপমহাদেশে এর প্রতিষ্ঠা করেন খাজা মুহম্মদ

বাকী বিল্লাহ বেরাঙ্গ। তিনি কাবুলে জন্মগ্রহণ করেন। বিদ্যাশিক্ষা করার জন্য বুখারা যান এবং সেখানে নকসবন্দিয়া সিলসিলাহ্‌র দীক্ষা নেন। পরে তিনি লাহোরে এক বৎসর এবং দিল্লীতে কয়েক বৎসর থেকে ১৬০৩ খ্রীস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। শেখ আহম্মদ সরাহিন্দী এ সিলসিলাহ্‌রই সাধক ছিলেন। তিনি শরিয়তের ওপর খুব জোর দিতেন। তাঁর মতে খোদা এবং তাঁর সৃষ্টি ভিন্ন। তিনি খুব জ্ঞানী এবং ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তিনি মোজাদ্দেদে আল-ফেহানী নামে পরিচিত। তিনি নকসবন্দিয়া তরিকাকে পুনর্বিন্যাস করেন। তাঁর আধ্যাত্মিক প্রতিপত্তি ভারতীয় উপমহাদেশের বাইরে তুরান, ইরাক, সিরিয়া, এশিয়া মাইনর প্রভৃতি দেশে প্রসারলাভ করেছিল। তিনি ১৬২৪ খ্রীস্টাব্দে পরোলোকগমন করেন। কথিত আছে যে, সম্রাট আওরঙ্গজেব এ সিলসিলাহ্ দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন।

হযরত আব্দুল কাদের জিলানীর নামানুসারে কাদেরীয়া তরিকার নামকরণ করা হয়েছে। তিনি গাওসেল আজম নামেই সবাইর নিকট সুবিদিত। ১১৬৫ খ্রীস্টাব্দে বাগদাদে তাঁর মৃত্যু হয় এবং এখানেই তাঁর সমাধি রয়েছে। বাংলায় তাঁর তরিকার বহু অনুসারী রয়েছে। তাঁর সংস্পর্শে এসে বহু ইহুদী এবং খ্রীস্টান ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন বলে জনশ্রুতি আছে।

মিয়া, মির এবং মোল্লাহ, শাহ কাদরী এ সিলসিলাহ্‌র দু'জন শ্রেষ্ঠ সাধক ছিলেন। মিয়া মির তাঁর লাহোর খানকায় কালাতিপাত করে গেছেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর, শাহজাহান এবং দারা সুকু প্রমুখ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন এবং তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতেন। কথিত আছে যে, শিখ গুরু তাঁর স্বর্ণমন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করার জন্য তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন। তিনি ১৬৩৫ খ্রীস্টাব্দে ইহধাম ত্যাগ করেন এবং লাহোরের বাইরে মিয়া মির গ্রামে সমাধিস্থ হন।

## টীকা প্রসঙ্গ ও গ্রন্থালোচনা

১। (ক) খৃস্টান সন্ন্যাসিগণ মহানবীর (দঃ) সময় এবং পরেও উলের (সূফ) পোশাক পরিহিত থাকতেন। তাই ফন্ ক্রেমার, ওলিয়ারী প্রমুখ ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ মনে করে থাকেন যে, উলের পোশাক পরিহিত মুসলিম সাধকগণ খৃস্টান সন্ন্যাসীদের দ্বারাই প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। এ অনুমান বৈ কিছুই নয়। কারণ, তখন আরব জগতে রেশম ইত্যাদির প্রচলন থাকা সত্ত্বেও সরল অনাড়ম্বর জীবনের প্রতীক হিসেবে খোদাভক্ত মুসলমানগণ মোটা উলের কাপড় পরিধান করতেন। বিশেষতঃ খৃস্টানদের 'দুনিয়া ত্যাগ নীতি' ইসলামী নীতিবিরুদ্ধ ছিল।

(খ) নিকোলসনের মতে (Nickolson—The Mystics of Islam) সূফীমতবাদ গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর মতবাদ দ্বারাই প্রভাবান্বিত এবং ব্রাউন (Browne—Literary History of Persia) প্রমুখের মতে সূফীমতবাদ পারসিকদের দ্বারাই প্রভাবান্বিত। আবার কেউ কেউ মনে করেন সূফীমতবাদ হিন্দু ভগবত গীতা বা বৌদ্ধ নির্বাণ ইত্যাদির প্রভাবেরই ফল। বিশদভাবে ব্যাখা করে দেখতে গেলে এ সব বাহ্যিক কোন কারণের ফলেই সূফীমতবাদের সৃষ্টি হয় নাই। আভ্যন্তরীণ কারণের ফলেই এর উদ্ভব হয়েছিল। কুরআন এবং রাসূলের বাণী সমকালীন রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, দার্শনিকদের এবং মুতাযিলাদের সীমাহীন যুক্তিবাদ, আশারীয়দের রক্ষণশীল আন্দোলন ইত্যাদির ফলেই সূফীমতবাদ গঠিত হতে থাকে।

কুরআন এবং হাদীসের তত্ত্ব গভীরভাবে অনুধাবন করার ফলে কাল্পনিক দর্শনের সৃষ্টি হয় এবং পরে তা সূফীমতবাদ নামে পরিচিতিলাভ করে। S. A. Ali—Spirit of Islam; Macdonald—Development of Muslim Theology)। বিভিন্ন দেশের সূফিগণ তাঁদের মতবাদের 'সিলসিলাহ্' বা

উৎপত্তির কথা উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত আলী (রাঃ) পর্যন্ত এসেছেন। বিশেষ করে আজমীরের হযরত মইনুদ্দীন চিশতী, মওলানা জালালুদ্দীন রুমী (তুর্কী), হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রাঃ) প্রমুখ তাঁদের আধ্যাত্মিক সম্পর্ক হযরত আলী (রাঃ)-এর সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন। হযরত আলী আধ্যাত্মিক দর্শনতত্ত্বের কথা তাঁর বক্তৃতার মাধ্যমেও ব্যক্ত করতেন, যেমন খোদা সম্পর্কে তিনি বলতেন, "যে খোদা কোথায় জিজ্ঞাসা করে সে তাঁর সঙ্গে অন্য কিছু কল্পনা করে থাকে। খোদা সৃষ্টিকর্তা এ বলে নয় যে তিনি নিজেই সৃষ্ট। তিনি বিদ্যমান রয়েছেন এ বলে নয় যে তিনি ছিলেন না। তিনি প্রত্যেক বস্তুর সাথে রয়েছেন সাদৃশ্য বা নৈকট্যের দিক দিয়ে নয়, তিনি প্রত্যেক জিনিসের বাইরে আছেন অথচ পৃথক নন। তিনিই প্রধান কারণ বা কর্তা, কার্যের বা চলার অর্থে নয়। তিনিই দর্শক কিন্তু কোন চোখ তাঁকে দেখতে পায় না। স্থান, সময় বা মাপ কিছুর সঙ্গেই তাঁর কোন সম্পর্ক নেই" – (নাহজুল বালাগাহ—শরীফ রেযা)।

একবিংশ অধ্যায়

# ইমাম গায্যালী (রাঃ)

## ইমাম গায্যালীর আবির্ভাবের তাৎপর্য

ইমাম গায্যালী (রাঃ) ইসলামের এক সঙ্কটময় মুহূর্তে আবির্ভূত হয়েছিলেন। মুতাযিলা এবং দার্শনিকদের প্রচলিত ধর্মমত পরিপন্থী যুক্তিবাদ, মুতাকাল্লিমদের এবং বিশেষ করে আশারীয়দের[১] কঠোর ধর্মীয় সংরক্ষণ নীতিমূলক যুক্তিতর্ক, আফ্রিকার হাসান ছাব্বার[২] ধ্বংসাত্মক তথাকথিত ধর্মীয় আন্দোলন ইত্যাদির ফলে বহু লোক অতিষ্ঠ হয়ে উঠতে থাকে এবং অবশেষে তারা সংগ্রাম ত্যাগ করে সুফী-মতকে একমাত্র স্বাধীন শান্তির পথ বলে বেছে নিতে থাকেন। ইসলামের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনের এমন দুর্দিনে দেখা দিলেন ইমাম গায্যালী (রাঃ)।[৩] তাঁর প্রচেষ্টায় ইসলাম সঞ্জীবিত হয়ে উঠলো। তিনি সুফী-মতবাদকে গ্রহণীয় পর্যায়ে উন্নীত করে সমাজে স্থিতিশীলতা এনে দিলেন। সুফীমত ও আশারীয় মতের সমন্বয় সাধন করে তিনি ইসলামের সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক জীবনে এক নূতন যুগের সূচনা করেন। তাই তাঁকে হুজ্জাতুল ইসলাম (Proof of Islam) এবং জয়নুদ্দীন (Ornament of religion) বলা হয়ে থাকে। তিনি ইসলাম ধর্মীয় জগতে সংস্কার সাধন করেছিলেন বলে কোন কোন মুসলমানের মতে তিনি ধর্মীয় শাস্ত্রবিদ ইমাম হিসেবে মযহাবী চার ইমামের সমকক্ষ ছিলেন।

## ইমাম গায্যালীর সংক্ষিপ্ত জীবনী

ইমাম গায্যালী (রাঃ)-র প্রকৃত নাম ছিল আবূ হামীদ মুহম্মদ আল গায্যালী। তিনি খোরাসানের অন্তর্গত তুস নগরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন

(হিঃ ৪৫০)। বাল্যকালে তিনি পিতৃহারা হন। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর পিতা তাঁর লেখা-পড়ার ভার তাঁর এক সুফী বন্ধুর ওপর ন্যস্ত করে যান। প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা সমাপ্ত করে গায্‌যালী ধর্মশাস্ত্র, দর্শন, বিজ্ঞান, আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ইত্যাদি বিষয় অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন। তাঁর বয়স বিশ হবার আগেই তিনি সব বিষয়ের তত্ত্ব অনুসন্ধান এবং বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করতেন। কোন কিছু না বুঝে তিনি গ্রহণ করতে রাজী হতেন না। সূফীদের দর্শনতত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করার উদ্দেশ্যে তিনি তাঁদের সঙ্গে মিশতে থাকেন। কিন্তু কোন কিছুই তাঁর মনের ওপর তেমন কোন রেখাপাত করলো না।

ইমাম গায্‌যালীর ছাত্রজীবনের পরবর্তী কালে তিনি নিশাপুরের ইমামুল হারামাইনের ছাত্র হিসেবে ছিলেন। ইমাম সাহেবের মৃত্যুকাল অবধি (৪৭৮ হিঃ) তিনি সেখানে প্রথমে তাঁর ছাত্র হিসেবে এবং পরে তাঁর সাহায্যকারী সহকর্মী হিসেবে অবস্থান করেছিলেন। অতঃপর তিনি বাগদাদের নিজামিয়া বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতে থাকেন। কিছুকাল অধ্যাপনা করার পর তিনি বাগদাদ ত্যাগ করে (৪৮৮ হিঃ) সিরিয়া গমণ করেন। সেখানে দু'বছরকাল তিনি সুফী জীবন-যাপন করেন। অতঃপর তিনি বিভিন্ন পবিত্র স্থান দর্শন করে তুস নগরে এসে নিজ পরিবার-পরিজনের সঙ্গে মিলিত হন।

তুস নগরে ইমাম গায্‌যালী (রাঃ) সাহেব প্রায় দশ বছরকাল সাধারণ এবং আধ্যাত্মিক গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এ সময়েই তিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞানের চরম অধিকারী হতে সমর্থ হয়েছিলেন।

৪৯৯ হিজরীতে ইমাম সাহেবকে পুনরায় নিশাপুর বিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজে যোগদান করতে হয়। কিন্তু সেখানে তিনি বেশীদিন থাকলেন না। শীঘ্রই তিনি সে চাকুরী ছেড়ে নিজ বাসস্থানে ফিরে আসেন এবং তাঁর শিষ্য সুফীদের খানকায় (monastery) এবং ছাত্রদের মাদ্রাসায় সময় অতিবাহিত করতে থাকেন। তিনি ৫০৫ হিজরীতে ইহধাম ত্যাগ করেন।

ইমাম গায্যালী (রাঃ) ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, মনস্তত্ব, স্বভাববিজ্ঞান, নীতি-বিজ্ঞান, তর্কশাস্ত্র, এলমেকালাম, তাসাওওফ প্রভৃতি বিষয়ের ওপর নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীতে বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। এগুলোর মধ্যে আরবীতে লিখিত 'এহ্‌য়াউল উলুম' এবং পার্সীতে লিখিত 'কিমিয়ায়ে ছা'আদাত' সর্বোত্তম গ্রন্থ বলে সর্বত্র বিবেচিত।

'এহ্‌য়াউল উলুম' সুফীমতবাদের দার্শনিক এবং নীতিজ্ঞান সম্পর্কে বিশ্বকোষ জাতীয় একটি মূল্যবান গ্রন্থ। কারও কারও মতে জগতের সমস্ত জ্ঞান-প্রদীপ নির্বাপিত হয়ে গেলেও একমাত্র তাঁর এহ্‌য়াউল উলুমের সাহায্যে সমস্ত জ্ঞান-প্রদীপ পুনরায় প্রজ্বলিত করা সম্ভব হবে।

ইমাম সাহেবের 'কিমিয়ায়ে ছা'আদাত' শরিয়তের বিধি-নিষেধের ওপর লিখিত একটি বিশদ গ্রন্থ তা কয়েক খণ্ডে বিভক্ত। শরিয়তের প্রত্যেক বিষয় যেমন নামায, রোজা, হজ্ব, যাকাত, বিবাহ, তাহারাত ইত্যাদি বিষয়ের যেমন বিস্তৃত নিয়ম-পদ্ধতি বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে তেমনি প্রত্যেক বিষয়ের আধ্যাত্মিক এবং দার্শনিক যুক্তিও সন্নিবেশিত রয়েছে। তাই তা মুসলিম জাহানের সর্বত্র পঠিত এবং আলোচিত হয়ে থাকে এবং তার বঙ্গানুবাদও আমাদের এদেশে সর্বত্র প্রচলিত রয়েছে।

ইমাম গায্যালী লিখিত 'মাকাসিদুল ফালাসিকা' নামে অপর এক গ্রন্থ ইউরোপীয় নানা ভাষায় অনূদিত হয়ে ইউরোপের বিভিন্ন লাইব্রেরীতে সুরক্ষিত হয়ে আছে। এতে দর্শনশাস্ত্রের উদ্দেশ্য এবং সমসাময়িক দর্শনের নানা দিক নিয়ে বিস্তারিত এবং গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রয়েছে। তাঁর 'তাহ্‌ফাতুল ফালাসিকা' অপর এক দার্শনিক গ্রন্থ। এতে তিনি দার্শনিকদের দৃষ্টিভঙ্গীর অসারতা প্রমাণ করেছেন।

### ইমাম গায্যালীর অবদান

ইমাম গায্যালী আশারীয়দের মৌলিক নীতির ভিত্তিতে দার্শনিকদের মুকাবেলা করেছিলেন। ধর্মীয় সত্য যুক্তিতে মেলেনা, তা অহীলব্ধ জিনিস এবং এ কারণেই কুরআনের সত্য অনস্বীকার্য। দর্শনের যুক্তি-

মানুষকে কেবল যুক্তি-তর্কের নিয়ম-কানুনে ভুল-ভ্রান্তি হতে রক্ষা করতে পারে, তা সাধারণ জ্ঞান এবং নিয়মতান্ত্রিক চিন্তা ব্যতীত কিছুই নয়। তা ওহীর ন্যায় কোন সত্যের সন্ধান দিতে পারে না। সুফীদের মতের প্রতিধ্বনি করে এবং মুতাকাল্লিম বা আশারীয়দের মতের বিরোধিতা করে তিনি বলেন যে, ওহী প্রদত্ত সত্য যাচাই করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এবং তা দিব্যজ্ঞান বা আত্মিক অনুভূতি (intudition) দ্বারাই সম্ভব। এ অনুভূতির দ্বারা মানুষ প্রত্যক্ষভাবে খোদার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম হয়। তিনি দার্শনিকদের কাছে কুরআনের রূপক ব্যাখ্যা দিতে প্রস্তুত ছিলেন, তবে তাঁদের সন্দিহান চিত্ত এবং মাত্রাহীন যুক্তি-ভিত্তিক আলোচনা তিনি পছন্দ করেন নি।

### ইমাম গায্যালীর দার্শনিক দৃষ্টি

ইমাম গায্যালীর মতে আমরা আমাদের চতুর্দিকে যা কিছু দেখতে পাই সব কিছুরই কারণ একমাত্র খোদাতা'লা। সমস্ত প্রকৃতির মূলেই রয়েছেন খোদা। সৃষ্ট জিনিসের রহস্য অনুধাবন করে তাঁকে বুঝতে হবে। তিনি সত্যের অতি উচ্চস্তরে অধিষ্ঠিত। এ স্তর যুক্তিতে পৌঁছান যায় না; কারণ তা অনুভূতি বা প্রদত্ত সত্যের ওপর নির্ভর করে। আধ্যাত্মিক শক্তি বা অনুভূতি দ্বারা এ স্তরে পৌঁছান যায়। আধ্যাত্মিক শক্তির উন্নতির দ্বারা সত্য এবং অদৃশ্য জগতের স্তরে মানবাত্মার উন্নতি হয়ে থাকে। ভবিষ্যতের গোপনতত্ত্ব এবং যুক্তির বাইরের ধারণা তখন প্রতিভাত হতে থাকে।

ইমাম গায্যালী বিজ্ঞানের সত্যতা অস্বীকার করেন নি। তবে তিনি বৈজ্ঞানিকদের সন্দিহান চিত্ত এবং আত্মবিশ্বাসের ঘোর বিরোধিতা করেছেন। তিনি যুক্তি দ্বারা দার্শনিকদের ধর্মবিরোধী মতবাদেরও (যেমন—খোদার attribute বা গুণ নেই; প্রথম কারণ কেবল অস্তিত্ব, সত্তা বা Essence নয়, প্রাকৃতিক নিয়ম অলঙ্ঘ্য ইত্যাদি) অসারতা প্রমাণ করে দিয়েছে।

## ইমাম গাযযালীর সূফীমতবাদ এবং সূফী জীবন সম্পর্কে ধারণা

ইমাম গায্‌যালী (রাঃ) সৃষ্টির রহস্যের পূর্ণ জ্ঞান রাখতেন বলে দাবি করতেন না। তাঁর মতবাদ পরবর্তী কালের সূফীদের মতবাদের ন্যায় তেমন গুপ্ত বা নিগূঢ় (Esoteric) ছিল না। তিনি এমন এক সূফী-জীবন দর্শন পদ্ধতি (তরিকা) দিয়ে গেছেন যা তাঁর মতে খোদার নৈকট্য এবং শেষ দর্শনের তৃপ্তিলাভ করবার সঠিক পথ বলে তিনি মনে করতেন। তিনি খোদার সৃষ্টিকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন—দৃশ্য এবং অদৃশ্য (visible & invisible)। দৃশ্য জগৎ (আলামুল মুল্‌ক্‌) পদার্থ গঠিত এবং তা পরিবর্তন ও পরিবর্ধনশীল। এ বিষয়ে তিনি মুতাযিলাদের সাথে একমত ছিলেন।

ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাইরে অবস্থিত অদৃশ্য জগতকে তিনি আবার দু'ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথমটি হলো 'আলামুল জাবারুত'। তা খাঁটি পদার্থ (matter) এবং খাঁটি আত্মার (Pure spirit) মধ্যে অবস্থান করে। তা সম্পূর্ণ পদার্থ বা সম্পূর্ণ আত্মা নহে; কিন্তু উভয়ের বৈশিষ্ট্য এতে বিদ্যমান। প্রাকৃতিক শক্তিগুলি এ পর্যায়েরই অন্তর্গত।

দ্বিতীয় অদৃশ্য জগৎ হলো সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক (আলামুল মালাকুত)। তা ভাব বা কল্পনার রাজ্য। তা খোদার সত্তার (Essence) অতি নিকটে অবস্থিত। মানবাত্মা এই রাজ্যে অবস্থান করে। তা তার আদি বাসস্থান হতে খোদার নির্দেশক্রমে আলোকরশ্মির ন্যায় আসে এবং পার্থিব শরীর হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে তার আদি বাসস্থানে আবার ফিরে যায়। এরই অর্থ হলো কুরআনের বাণী, "আমরা খোদার নিকট হতে আসি এবং তাঁরই নিকট আমরা পুনরায় ফিরে যাই (২ : ১৫৬)"।

মুতাযিলাদের মতে কুরআনে উল্লেখিত 'মিজান,' 'কলম,' 'লাওহ' প্রভৃতি রূপক অর্থে ব্যবহৃত; কিন্তু ইমাম গায্‌যালীর মতে এ সব আলামুল মালাকুতেই অবস্থান করে থাকে।

সূফীমতবাদের চরমপন্থীদের মতে শেষ নৈকট্য লাভের ফলে মানবাত্মা পরমাত্মার সাথে মিলিত হয়ে যায়। একে 'হলুল' (absorption) এবং

কখনও ইত্তিহাদ (Union) বলা হয়ে থাকে। কিন্তু গায্যালী সাহেব এরূপ মতবাদের বিরোধিতা করেছেন। তিনি কুরআনেরই অনুসারী ছিলেন এবং কুরআনের মর্মেরই বিশ্বাসী ছিলেন। তা হলো এই যে মানবাত্মা খোদারই নির্দেশে আলামুল মালাকুত হতে আসে এবং তাঁরই নির্দেশে যথাস্থানে আবার ফিরে যায় (সৈয়দ আমীর আলী)।

## টীকা প্রসঙ্গ ও গ্রন্থালোচনা

১। মুতাযিলাদের ধর্ম বিরোধী মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে মুতাকাল্লিমগণ দার্শনিক যুক্তিতর্ক (কালাম) দ্বারা তাঁদের পুরাতন ধর্মমত অক্ষুণ্ণ রাখতে চেষ্টা করতেন। তাঁদের তর্কের ভিত্তি ছিল 'ওহী' (মুতাযিলাদের ন্যায় যুক্তি নহে)। এই প্রচেষ্টায় সর্বপ্রধান কৃতী ব্যক্তি হলেন আবুল হাসান আলী-আল-আশারী (জন্ম বস্রা, ২৬০ হিঃ; মৃত্যু বাগদাদ, ৩২৪ হিঃ)। আশারীয় মতবাদ পরে আল বাকীলানী এবং ইমাম গায্যালী গ্রহণ করেছিলেন এবং এর পরিবর্ধনও করেন। আশারীয়দের বিশিষ্ট অবদান হতো তাঁদের 'পারমাণবিক মতবাদ'। তাঁদের মতে (আল-বাকীলানী) পৃথিবীর সব কিছুই পরমাণু দ্বারা গঠিত। পরমাণুর সংযোগ এবং বিচ্ছেদ দ্বারা সবকিছুরই সৃষ্টি হয় এবং ধ্বংস হয়। খোদার হুকুমেই পরমাণু সৃষ্টি হয় এবং যতদিন তিনি তা সৃষ্টি করতে থাকবেন ততদিন পৃথিবীর অস্তিত্ব থেকে যাবে। এ মুতাযিলাদের 'পদার্থের (matter) স্থায়িত্বের মতবাদ' এবং এরিস্টোটলের 'স্থিরীকৃত পৃথিবী (Fixed Universe)—মতবাদের' পরিপন্থী দার্শনিক বিপ্লবই বটে।

২। হাসান সাব্বাহ মিসরের ফাতেমীর খলীফা নিয়ামের প্রতিনিধি হিসেবে মুসলমানদের ইমাম বলে দাবী করতেন। তাঁর অনুসারিগণ সর্বপ্রথম ধ্বংসাত্মক কার্যে আত্মনিয়োগ করেছিল।

৩। Macdonald—Development of Muslim Theology; S. Ameer Ali—The spirit of Islam.

## আলোচিত বই-এর তালিকা (Bibliography)


১। সৈয়দ আমির আলী—The spirit of Islam.

২। ,, ,, ,, —History of the Saracenes.

৩। ডঃ ইকবাল—Reconstruction of Religious Thoughts in Islam.

৪। মওলানা মুহম্মদ আলী—Religion of Islam.

৫। খোদা বক্স—Arab Civilization.

৬। এম. পিকথল—Cultural side of Islam.

৭। পি. কে. হিট্টি—History of the Arabs.

৮। নিকোলসন—Literary History of the Arabs.

৯। ,, —The Mystics of Islam.

১০। ব্রাউন—Literary History of Persia.

১১। ষ্টোভার্ড—New world of Islam.

১২। ওলীয়ারী—Arabic Thought.

১৩। মেকডোনেল্ড—Development of Muslim Theology.

১৪। ই. আরনল্ড—Preaching of Islam.

১৫। বস ওয়ার্থ স্মিথ—Life of Muhammad.

১৬। হিউজেস—Dictionary of Islam.

১৭। গেলোয়া—Philosophy of Religion.

১৮। Survey of International Affairs (1920—23).

১৯। আবদুল্লাহ্ ইউসুফ আলী—পবিত্র কুরআনের তর্জমা।

২০। পিকথল— ,, ,, ,, ।

২১। মাঃ আশরাফ আলী থানভী (রাঃ)—বায়ানুল কুরআন।

২২। মাঃ নুর মুহম্মদ আযমী—(মেশকাত হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস)। ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড।

২৩। ইমাম গায্‌যালী—কিমিয়ায়ে ছা'দাত ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড।

২৪। মাঃ আশরাফ আলী থানভী—মোওয়াযেযে আশরাফিয়া।

২৫। হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ্—হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাহ্।
২৬। ,, —মুছাওয়া।
২৭। ,, —ইকদুলজীদ।
২৮। আবু দাউদ।
২৯। মীযানে শারানী।
৩০। তাবাকাতে ইব্নে ইছাবাহ্।
৩১। কানযুল উম্মাল।
৩২। তালীকুছ ছাবীহ্।